দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

যা দেবী সর্বভুতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

অধুনা দুর্গাপূজায় আড়ম্বর আর উৎসব অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অনুভব যে নিতান্তই গৌণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের এই অনুভবহীনতার পেছনে কী কারণ? শৈশব থেকেই শুনে আসছি দুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্বে মহালয়া। কিন্তু মহালয়া কী, তা কারো কাছ থেকে শোনা হয়ে ওঠেনি। শুনেছি লক্ষ্মী-সরস্বতী দুর্গার কন্যা। সত্যি কি তাই? কেউ বলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বহু-ঈশ্বরবাদী, আবার, কেউ বলে একেশ্বরবাদী। আসলে আমরা কী? যদি একেশ্বরবাদী হই, তবে বহু দেবদেবীর পূজা কেন? দুর্গাদেবী কে? পরমেশ্বরের সাথে দুর্গাদেবীর কী সম্পর্ক? এমন বহু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস আমাদের নেই বা জানতে চাইলেও কোথায় পাওয়া যাবে, এত সব অনুসন্ধিৎসা আর সংশয়ের সমাধান? এ সকল সংশয়ের সমাধানস্বরূপ ও বর্তমান অপসংস্কৃতির তাণ্ডবে ধ্বংসপ্রায় বৈদিক সংস্কৃতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' গ্রন্থটি।

৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০
e-mail: arsandhane@gmail.com

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য:
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-
এর শিক্ষার আলোকে রচিত ও সংকলিত

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

প্রকাশক

শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী

সংকলন ও সম্পাদনা সহযোগী

রসিক কানাই দাস
সুদর্শন নিমাই দাস
অমিত দাস
রামপ্রসাদ চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রী তারক কৃষ্ণনাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী দ্বিজেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী
অক্ষয় লীলামাধব দাস, ঠাকুর নরোত্তম দাস

প্রথম প্রকাশ

শারদীয় দুর্গাপূজা, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রচারমূল্য: ৫০ টাকা

প্রকাশনায়

অমৃতের সন্ধানে প্রকাশন
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, ইস্কন
৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা, বাংলাদেশ। মোবাইল: ০১৭৩৩২০৮৭০৬, ০১৯১৪৫৭২৩৯৪
ইমেইল: arsandhane@gmail.com

উৎসর্গ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর

করকমলে

সূচিপত্র

পর্ব ১: দুর্গাতত্ত্ব

পর্ব ২: দুর্গাপূজার ইতিকথা

পর্ব ৩ : দুর্গাপূজা ও কিছু অজানা কথা

পর্ব ৪ : ভগবান ও দেবদেবীর সম্পর্ক

অবতরণিকা

পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রকাশ দেবীদুর্গা। *যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতাঃ।* ঘরে ঘরে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার নাম শোনা যায়। বিশেষত বাঙালিদের প্রধান উৎসব বলা যায় দুর্গাপূজাকে। প্রতিবছর মায়ের আগমনকে কেন্দ্র করে মাকে বরণ করে নিতে উৎসব ও আড়ম্বরের কোনো কমতি হয় না। কিন্তু অধুনা দুর্গাপূজায় উৎসব অপেক্ষা অনুভব যে নিতান্তই গৌণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাকে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টির কথা বিবেচনা না করে সাজসজ্জা আর আড়ম্বরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়াটাই এখনকার ফ্যাশন। আমাদের এই অনুভবহীনতার পেছনে কী কারণ? আমরা কি তা কখনো ভেবে দেখেছি? শৈশব থেকেই শুনে আসছি দুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্বে মহালয়া। কিন্তু মহালয়া কী, তা কারো কাছ থেকে শোনা হয়ে ওঠেনি। গণেশের পাশে যে কলাগাছ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে কী? শুনেছি লক্ষ্মী-সরস্বতী দুর্গার কন্যা। সত্যি কি তাই? কেউ বলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বহু-ঈশ্বরবাদী, আবার, কেউ বলে একেশ্বরবাদী। আসলে আমরা কী? যদি একেশ্বরবাদী হই, তবে বহু দেবদেবীর পূজা কেন? মাতা সম্বোধন সত্ত্বেও কালী মাতাকে মায়ের মতো কোমলরূপে নয়, অদ্ভুত উগ্ররূপে কেন আরাধনা করা হয়? দেবী দুর্গাকে কখনো দুর্গতিনাশিনী, আবার, কখনো দুর্গতিদায়িনী বলেও সম্বোধন করা হয়। কেনই বা তিনি দুর্গতিনাশিনী, আর কেনই বা তিনি দুর্গতিদায়িনী? জগজ্জননী বলে খ্যাত মাতা দুর্গা কীভাবে আমার মাতা হলেন? দুর্গাপূজার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতারই বা কী তাৎপর্য? এরকম হাজারো প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু এর অনুসন্ধানের প্রয়াস আমাদের নেই বা জানতে চাইলেও কোথায় পাওয়া যাবে এত সব অনুসন্ধিৎসা আর সংশয়ের সমাধান?

বর্তমান অপসংস্কৃতির তাণ্ডবে ধ্বংসপ্রায় বৈদিক সংস্কৃতিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে

আনার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণভাবে এসব সংশয়ের শাস্ত্রীয় সমাধান দেয়া হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। মায়ের প্রতি হৃতশ্রদ্ধা পুনরুদ্ধার ও আধ্যাত্মিকত অনুভবহীন উৎসব সর্বস্ব পূজার অপসংস্কৃতির হাত থেকে সনাতন সংস্কৃতিকে মুক্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। মায়ের পূজার মাধ্যমে মাকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাঁকে মর্যাদা তো দূরে থাক, অপমান করার যে অসুস্থ চর্চা (অশালীন নাচ-গান, মদ্যপান ইত্যাদি) আমরা করছি, তাতে দুর্গতিনাশিনী মায়ের করুণালাভের পরিবর্তে আমরা মায়ের অসোন্তষের কারণ হচ্ছি।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে সুধী পাঠকগণ দেবী মায়ের প্রকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাঁর সম্পর্ক, দেবী মায়ের নানারূপের হেতু, দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাবে। আশা করি, গ্রন্থটি বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতসমাজ ও আধুনিক যুক্তিবাদী যুবসমাজ উভয়ের কাছে আদরণীয় হবে। গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কারো এতটুকু উপকার হয়, তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মুদ্রণে শতভাগ শুদ্ধতা প্রথম প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই ভুল-ত্রুটি বিচারে ক্ষমাশীল হয়ে গ্রন্থের সারবস্তু গ্রহণের জন্য পাঠকগণের প্রতি বিনম্র অনুরোধ রইল। পরিশেষে, পাঠকালীন যেকোনো অসঙ্গতি, ভুল-ত্রুটি অবহিত করে সংশোধনের সুযোগ দান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। –হরেকৃষ্ণ

বিনীত
প্রকাশক

পরমব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি

দুর্গতিনাশিনী 'দুর্গা' নামটির সঙ্গে বিশেষত বঙ্গবাসী অতি পরিচিত। প্রধানত, শাক্তরা প্রতিবছর ঘটা করে শক্তিরূপে দেবীদুর্গার পুজো করে থাকেন। তবে, শুধু নামে পরিচিত হলেও অধিকাংশ লোকের কাছেই তাঁর তত্ত্ব অজানা। শক্তি সম্পর্কে জানতে সেই শক্তির উৎস বা ধারক সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

সমস্ত শক্তির আধার পরমেশ্বর ভগবান পরমব্রহ্ম নামে জগদ্বিদিত। বৃহৎ ধাতু হতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন; যাঁর অর্থ– *বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম*; যিনি স্বয়ং বৃহৎ (বড়) এবং যিনি বৃহৎ করেন (বৃংহয়তি)। বিষ্ণুপুরাণ (১/১২/৫৭) বলেন–

বৃহত্ত্বদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥

অর্থাৎ, বৃহত্ব এবং বৃহণত্ব আছে বলেই ব্রহ্ম পরম তত্ত্ব। এর সমর্থনে শ্বেতাশ্বতরে (৬/৮) বলা হয়েছে– *ন তৎসমোহভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥*– তাঁর সমানও কিছু দেখা যায় না, তাঁর থেকে বড়ও কিছু দেখা যায় না, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭.৭) শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন– *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।* "হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ বস্তুও নেই।"

যিনি বড় করেন, তাঁর নিশ্চয়ই বড় করার শক্তিও আছে। তাই তিনি শক্তিমান। আর, তাঁর সমান বা অধিক শক্তি কারো নেই বলে তিনি সর্বশক্তিমান। আবার, শক্তিতে বৃহৎ হওয়ায়, শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণেও তিনি সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বৃহৎ। তাই তাঁর শক্তি অনন্ত। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৬/৮) বলা হয়েছে–

পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥

এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা শক্তি আছে; জ্ঞানবলক্রিয়াও আছে এবং এগুলো স্বাভাবিকী। বস্তুর যে শক্তি বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান, তা ঐ বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি। যেমন, অগ্নির দাহিকাশক্তি, যাকে অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নিতে উত্তপ্ত লোহার দাহিকা শক্তি স্বাভাবিকী নয়, কেননা লোহার সেই শক্তি আগুনে রাখার

পূর্বেও ছিল না এবং আগুন থেকে সরিয়ে নেয়ার কিছুক্ষণ পরেও তা থাকবে না; তাই তাকে বলা হয় আগন্তুকী শক্তি। তাই অগ্নিতে উত্তপ্ত অবস্থায় লৌহে দাহিকাশক্তি থাকলেও তাকে লৌহের শক্তি বলা হয় না, তা আগুনেরই শক্তি। সুতরাং, কোনো বস্তুর শক্তি আছে বললে তা ঐ বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তিকেই বোঝায়, যে শক্তি সেই বস্তুতে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিদ্যমান। অতএব, পরমব্রহ্মের শক্তি আছে বললে বুঝতে হবে তা তাঁর স্বাভাবিকী শক্তি এবং পরমব্রহ্ম নিত্যবস্তু বলে তাঁতে বিদ্যমান শক্তিও নিত্য। এমনকি জড় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারেও শক্তি নিত্য, তার কখনো বিনাশ হয় না, কেবল রূপান্তর হতে পারে।

পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের যে স্বাভাবিকভাবেই অনন্ত শক্তি রয়েছে তা শ্রুতিশাস্ত্র থেকে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তিকে তিন প্রকারে বিভাজন করা হয়েছে এবং এ তিন প্রকার শক্তিরই অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে।

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৬.৭.৬১)

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার– পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে চিৎ-শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরাশক্তিসম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তি বা মায়াশক্তি। *'পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'* ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বাক্যে পরাশক্তির কথা; *অজামেকাং লোহিতশুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ ॥ (শ্বেতাশ্বতর, ৪.৫); মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িন্তু মহেশ্বরম্ ॥ (শ্বেতাশ্বতর, ৪.১০) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে* এবং *'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দূরত্যয়া।' (৭/১৪) ইত্যাদি গীতাবাক্যে ত্রিগুণাত্মিকা 'মায়াশক্তির' কথা এবং 'অপরিমেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥' ইত্যাদি গীতা (৭/৫)-বাক্যে 'জীবশক্তির' কথা জানা যায়। তাই, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য ৪/১১৬) বলা* হয়েছে–

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥

অতএব, পরমব্রহ্মের শক্তি প্রধানত তিন প্রকার, যেগুলোকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এবং এই ত্রিবিধ শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি রয়েছে। নিম্নে একটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে এই বিবিধ শক্তি উপস্থাপন করা হলো।

পরমব্রহ্মের বিবিধ শক্তি ও তার বৃত্তি

- **১. পরাশক্তি/চিৎ-শক্তি/স্বরূপশক্তি/অন্তরঙ্গাশক্তি (যোগমায়া)**
  - সন্ধিনী (সৎ)   সম্বিৎ (চিৎ)   হ্লাদিনী (আনন্দ)
- **২. অপরাশক্তি/মায়াশক্তি/বহিরঙ্গাশক্তি/ ভিন্না (মহামায়া)**
  - জীবমায়া   গুণমায়া
  - আবরণাত্মিকা ও প্রক্ষেপাত্মিকা
  - সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ
  - বিদ্যা ও অবিদ্যা (মায়ার নিমিত্তাংশের বৃত্তি)
- **৩. জীবশক্তি/তটস্থাশক্তি**
  - নিত্যমুক্তজীব ও বদ্ধজীব
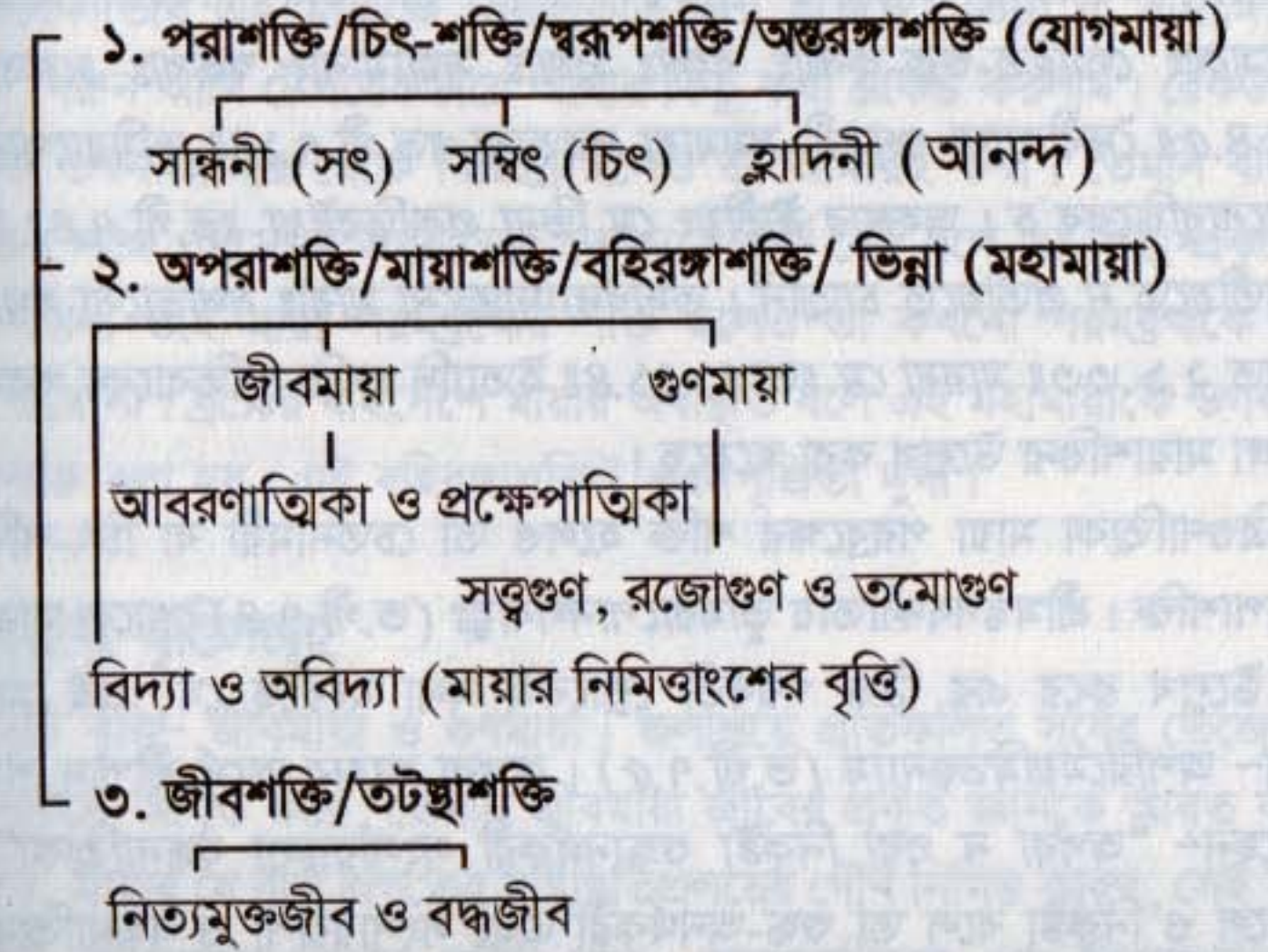
১. পরাশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি

পরাশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলে একে স্বরূপশক্তি বা স্বরূপভূতা শক্তি বলা হয়। এই শক্তি জড়বিরোধাত্মক বা চিন্ময়ী বলে একে চিৎ-শক্তিও বলা হয়। স্বরূপে অবস্থিতিবশত পরমব্রহ্মের সাথে এর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বিধায় একে অন্তরঙ্গাশক্তিও বলা হয়। আবার, স্বরূপ ও মহিমায় অপর দুই শক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ বলে একে পরাশক্তি বলা হয়। অর্থাৎ, ভগবানের এই শক্তি– **চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি এবং পরাশক্তি** নামে অভিহিত হয়।

এই অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটি বৃত্তি। যথা: ১. সন্ধিনি, ২. সম্বিৎ ও ৩. হ্লাদিনী। *হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১.১২.৬৯)*। এই শ্লোকের ওপর শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদের টীকা অনুসারে– পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান সচ্চিদানন্দময়। তাঁর সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানময়) আনন্দের (আনন্দময়) সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনি, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে অভিহিত হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ৪.৬১-৬২) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ–যারে জ্ঞান করি মানি ॥

২. অপরাশক্তি বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি

পরমেশ্বর ভগবানের জড়রূপা শক্তিকে বলা হয় তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। *অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ ॥শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ৪.৫॥ দৈবীহ্যষা গুণময়ী* ***মমমায়া*** *দূরত্যয়া ॥ভ.গী.৭.১৪॥ ভূমিরাপোনলবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার* ***ইতীয়ং*** *মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ভ.গী.৭.৪॥ ঋতের্থং যৎ প্রতীয়তে ন প্রতীয়তে চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদা****ত্মনো মায়াং*** *যথাভাসো যথা তমঃ॥ ভাগবত ২.৯.৩৩॥ মায়য়া মে ॥ভা.১১.১১.৪॥* ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে পরমব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া পরব্রহ্মের শক্তি হলেও তা চেতনাময়ী বা চিৎ-শক্তি নয়, জড়রূপাশক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *ভূমিরাপোনলবায়ুঃ (ভ.গী.৭.৪)* শ্লোকে মায়াশক্তির কথা উল্লেখ করে এর ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই বলা হয়েছে যে, এই মায়াশক্তি অপরা– *অপরিমেয়মিতস্তন্যাম্ (ভ.গী.৭.৫)*। *অপরা* শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখেছেন– *"অপরা ন পরা নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা"*– পরা নয় বলে ও নিকৃষ্টা বলে তা শুদ্ধ-অনর্থকরী এবং সংসাররূপা ও বন্ধনাত্মিকা বলে মায়াকে অপরা বলা হয়েছে। এই মায়া নিকৃষ্টা কেন, সে সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য বলেছেন– *"ইতস্তু অন্যামিতোহচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতয়াঃ"*– এই মায়া অচেতনা, চেতনভোগ্যভূতা। শ্রীধরস্বামীপাদ লিখেছেন– *'নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ'* – অর্থাৎ, জড় বলে মায়া নিকৃষ্টা। শ্রীপাদ বলদেব, মধুসূদন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁদের প্রত্যেকেই লিখেছেন–*'নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ'* – অর্থাৎ, জড়রূপা বলেই মায়া নিকৃষ্টা বা অপরা।

যা অচিৎ বা চিদ্বিরোধী তা-ই জড়; আর যা অজড় বা জড় নয়, তা-ই চিৎ। সুতরাং, ভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট। চিচ্ছক্তি চেতনাময়ী, মায়াশক্তি অচেতন। চিচ্ছক্তি স্বপ্রকাশ, অপরকেও প্রকাশ করতে পারে; আর মায়াশক্তি স্বপ্রকাশ নয়, অপরকে প্রকাশ করতে পারে না। চিচ্ছক্তি সূর্যসদৃশ, মায়াশক্তি অন্ধকারসদৃশ। সাপের পরিত্যক্ত খোলস সাপেরই অংশ। কিন্তু সাপ চেতনবস্তু হলেও তার পরিত্যক্ত খোলস অচেতন, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার পরিত্যক্ত অংশভূতা বহিরঙ্গামায়াও অচেতন বা জড়রূপা। এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৪.৫) বলা হয়েছে–***অজো হ্যেকা জুষমাণোহনুশতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্য॥*** "এক অজ (জীব) এই মায়াকে ভোগকরে মায়া কর্তৃক আলিঙ্গিতা হয়ে থাকে, অপর এক অজ (পরমাত্মা) ভুক্তপদার্থের ন্যায় তাকে পরিত্যাগ করেন।" সাপের খোলস স্বরূপত সাপের অংশ হলেও সাপের দেহের বাইরে থাকে, এই খোলস সাপকে স্পর্শ করতে পারে না, সাপও সেই খোলসকে

কখনো স্পর্শ করে না, তেমনি বহিরঙ্গামায়াও পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

তাই ভগবদ্গীতায় এই মায়াকে ভিন্নাপ্রকৃতি বলা হয়েছে। ভিন্না বা বহিরঙ্গা এই অর্থে যে, ধরুন আমি টেপরেকর্ডারে আমার কিছু কথা রেকর্ড করলাম। রেকর্ড করা কথাগুলো তখন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা আমারই কথা। তেমনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতক্ষ্য সম্পর্ক নেই বলে তা ভিন্না প্রকৃতি বা বহিরঙ্গাশক্তি। তাই মায়া পরমব্রহ্মের শক্তি হলেও তা কখনো পরমব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্মের বহির্দেশে মায়ার অবস্থিতি বলে এই মহামায়াকে ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি বলা হয়। এই বহিরঙ্গাশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা।

❋ মায়ার বৃত্তিসমূহ

মায়ার দুটি বৃত্তি– জীবমায়া ও গুণমায়া। জলাশয়ে প্রতিফলিত সূর্যের তেজোরাশি যেরূপ দৃষ্টিকে আবৃত করে, তেমনি জীবমায়া জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে। অন্যভাবে, মায়ার যে বৃত্তি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের গৌণ নিমিত্ত কারণ, সেই বৃত্তিই জীবমায়া। জীবমায়ার আবার দুইটি বৃত্তি– আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের মধ্যে থেকে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান তথা চিদ্বস্তু ও ভগবদ্দাসত্বরূপ স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করে; আর বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি জীবের মধ্যে অন্যজ্ঞান জন্মায়, যার ফলে জীব দেহতে আত্মবুদ্ধি জন্মায় এবং জড় বিষয়ভোগে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। আবার, সত্ত্ব-রজো-তম– মায়ার এই তিনটি গুণ জগতের গৌণ উপাদানকারণ, একেই বলা হয় গুণমায়া। (এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হয়েছে।) মায়ার নিমিত্তাংশের দুইটি বৃত্তি– বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা স্বত্ত্বগুণময়ী; আর অবিদ্যা রজ-তমোগুণময়ী। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১.১১.৩) ভগবান উদ্ধবকে বলেন–

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী অদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥

"হে উদ্ধব, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) উভয়ই আমার মায়ার দ্বারা সৃষ্টি এবং তা আমারই শক্তির অভিপ্রকাশ। উভয়ই অনাদি অনন্তস্বরূপ এবং দেহধারী জীবদের নিত্যকাল মুক্তি ও বন্ধনদশা ভোগ করায়। যখন আমি আবিদ্যাকে প্রেরণ করি, তখন জীবের বন্ধন হয়ে থাকে; আর যখন বিদ্যাকে প্রেরণ করি, তখন মোক্ষের স্ফূর্তি হয়।" আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা– মায়ার অবিদ্যা অংশেরই বৃত্তি।

২. তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিকশাস্ত্র অনুসারে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ– *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ ভ.গী.১৫.৭॥* । *মম অংশ্যস্য জীবস্য॥ ভা.১১.১১.৪॥* জীব স্বরূপত চিদ্‌রূপা, জড় নয়, তাই পরমব্রহ্মের সাথে তাঁর সংস্পর্শ হতে পারে। স্বরাট পরমব্রহ্মের অংশ বলে জীবের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতা রয়েছে। সেই স্বাতন্ত্র্য দ্বারা জীব ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তিতে অবস্থান করতে পারে, আবার, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীনে এ জড়জগতেও আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। তাই জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়। অবস্থান বা স্থিতিভেদে জীব দুই শ্রেণির– নিত্যমুক্ত এবং অনাদিকাল থেকে মায়াবদ্ধ, যাকে নিত্যবদ্ধও বলা হয়। মায়াবদ্ধ জীব জড়জগতে জন্মমৃত্যু আদি নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে এবং ভগবানের কৃপায় মায়ামুক্ত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে, যেখানে জীব তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যসেবায় যুক্ত হয়।

এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য দেবী দুর্গা, যিনি ভগবানের ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির মূর্ত প্রকাশ। তাই এখানে আমরা বিশেষত মায়াশক্তি বিষয়েই আলোচনা করব।

❋ মায়া পরমেশ্বরের অধীন তত্ত্ব

ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, জড়রূপা মায়া অন্ধকার সদৃশ, চিচ্ছক্তি সূর্যসদৃশ। আর পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই চিন্ময়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে– ***কৃষ্ণসূর্যসম মায়া হয় অন্ধকার। যাহা কৃষ্ণ, তাহা নয় মায়া অধিকার॥***

শক্তি শক্তিমানের অধীন (পরে আলোচনা করা হবে)। সুতরাং, মায়াশক্তিও যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অধীন তত্ত্ব, তা আর বলা অপেক্ষা রাখে না। বেদে বলা হয়েছে– ***মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ॥ শ্বেতাশ্বতর ৪.৯॥*** অর্থাৎ, "মায়ার তথা প্রকৃতির অধিপতি পরমেশ্বর ভগবান এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন।" ঠিক যেমন সমস্ত অবতারের উৎস বলে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারী বলা হয়, তেমনি মায়ার অধীশ্বর বলে ভগবানকে এখানে মায়ী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রে–

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥শ্বেতাশ্বতর ৪.১০॥

অর্থাৎ, "এই প্রকরণে মায়া নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সে তো শ্রীভগবানের শক্তিরূপা প্রকৃতি এবং মায়া নাম্নী শক্তিরূপা প্রকৃতির অধিপতি হলেন পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের শক্তিরূপা প্রকৃতিরই অঙ্গভূত কারণকার্যসমুদয়ে এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত রয়েছে।"

তাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (৬২.১৮) মেধস ঋষি বলেছেন–

করোতি মায়াচ্ছন্নম্ বিষ্ণুমায়া দূরত্যয়া।
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য ত্রিগুণা বিশ্বমাজ্ঞয়া ॥

অর্থাৎ, "অবিনাশী সত্ত্ব-রজো-তম–এ ত্রিগুণময়ী দেবী বিষ্ণুমায়া গুণাতীত পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারেই বিশ্বসংসার মায়ায় আচ্ছন্ন করছেন।"

(যোগমায়া এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতার সারকথা বিষয়ক আলোচনায় আরো প্রমাণ ও যুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগমায়া বা শক্তি পরমব্রহ্মেরই অধীন তত্ত্ব এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন)

❋ যোগমায়া ও মহামায়ারূপে দুর্গা

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী দুর্গাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে–

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

অর্থাৎ "যে দেবী সর্বভূতে (সর্বজীবে) বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে বারংবার নমস্কার।"

সাধারণ অর্থে মায়া শব্দে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই বোঝায়, যা তাঁর চিচ্ছক্তিরই ছায়াস্বরূপা। তবে ভগবানের আরেক প্রকার মায়াশক্তি রয়েছে, যা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি এবং একে বলা হয় যোগমায়া। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি দুই প্রকার মায়াশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। যথা:

১. যোগমায়া (অন্তরঙ্গাশক্তি)
২. মহামায়া (বহিরঙ্গাশক্তি)

তাই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে (১১.৫) বলা হয়েছে–

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ।
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু ॥

"হে দেবী, আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করে আছেন, আবার, আপনিই প্রসন্ন হলে মুক্তির কারণ হয়ে থাকেন।" এবার আমরা দেখব যে, কীভাবে দেবী মায়াগ্রস্ত করেন, আবার, মায়ামুক্ত করেন।

১. যোগমায়া (অন্তরঙ্গাশক্তি): শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুই প্রকার মায়ার কথা উল্লেখ করেছেন। *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতম্।* অর্থাৎ 'আমি সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি না, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখি।" তাই যতক্ষণ তিনি সেই আবরণ থেকে নিজেকে প্রকাশ না করেন, ততক্ষণ কেউ তাঁকে জানতে পারে না। তিনি কৃপা করে যে মাত্রায় নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই মাত্রায় জীব তাঁকে এবং নিজেকে জানতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ভগবানের সমস্ত লীলা সম্পাদিত হয় যোগমায়ার দ্বারা।

তবে কি যোগমায়া ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন? না। যেমন, স্ক্রিপ্টরাইটার নাটক রচনা করেন, নির্দেশক বা পরিচালক স্ক্রিপ্ট অনুসারে নাটকটি পরিচালনা করেন এবং অভিনেতারাও সে অনুসারেই অভিনয় করেন। অর্থাৎ, মূল হলেন স্ক্রিপ্টরাইটার। আর ভগবানের বিবিধ লীলায় ভগবান নিজেই স্ক্রিপ্টরাইটার এবং তিনি নিজেই অভিনেতা। তাই, আপাতদৃষ্টিতে যোগমায়াকে ভগবানের লীলার পরিচালিকারূপে মনে হলেও, মূলত ভগবানের দেয়া নির্দেশ অনুসারেই তিনি তা পরিচালনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, ভগবান তাঁর লীলাবিলাসের পূর্বেই, কী কী প্রকারে লীলা সংঘটিত হবে তা মায়াদেবীর নিকট বর্ণনা করছেন এবং তাঁকে নির্দেশনা দিচ্ছেন– তাঁকে কী কী করতে হবে।

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।

প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥ (ভাগবত ১০.২.১৪)

"ভগবানের দ্বারা এভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দগোকুল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন।"

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রীং দেবদেবেন বৈ তদা। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫.২.১)। অর্থাৎ, তখন জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রা তথা যোগমায়া *'যথোক্তং দেবদেবেন'*– দেবদেব বিষ্ণু যেরূপ বলেছিলেন, সে অনুসারে কার্য করেছিলেন। *'যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা' (বিষ্ণুপুরাণ ৫.২.৩), 'মম আদেশাৎ' (বিষ্ণুপুরাণ ৫.১.৭০), ভগবানপি বিশ্বাত্মা...যোগমায়া সমাদিশৎ (ভাগবত ১০.২.৬)*– পরমেশ্বর ভগবানের আদেশানুসারে যোগমায়া কার্য করেন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪.৬), শ্রীমদ্ভাগবত (১০.৩.৪৬) এবং মহাভারতাদি (আশ্বমেধিকপর্ব ১৭০.২৮) বৈদিক শাস্ত্রে একে *'আত্মমায়া'* বা 'আমার মায়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় যে, 'মায়া' পরমেশ্বর ভগবানের

অধীন তত্ত্ব।

সুতরাং, যোগমায়াও ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। একারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যোগমায়ার দ্বারা তিনি নিজেই নিজেকে আবৃত রাখেন, সর্বদা প্রকাশ করেন না– *ন অহম্ প্রকাশ।* কৃষ্ণলীলায় এই যোগমায়া গোপিকাদের পুজিত কাত্যায়নী, যশোদার কন্যা, পৌর্ণমাসী এবং সুভদ্রারূপে প্রকাশিত হন।

২. মহামায়া (বহিরঙ্গাশক্তি): যোগমায়া ভগবানের স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তিস্বরূপা, আর মহামায়া তারই অংশ বা ছায়াস্বরূপা; তাই তা বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবদ্গীতায় (৭.১৪) ভগবান বলেছেন, *দৈবীহ্যাষা গুণময়ী **মমমায়া দূরত্যয়া।*** এখানে ত্রিগুণময়ী মহামায়ার কথা বলা হয়েছে। মহামায়ারূপে দেবী দুর্গা ভগবদ্বিমুখ জীবকে ত্রিগুণ দ্বারা মোহিত করে জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রকৃত জ্ঞান হলো জীব কৃষ্ণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ, অনুসদৃশ আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস, আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সকলের পরম প্রভু। দেবীদুর্গা কর্তৃক মায়াচ্ছন্ন হওয়ার ফলে জীব নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থরূপে জানতে পারে না। মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়েই জীব ভগবানকে ভুলে যায় এবং জড় দেহকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে। এভাবে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে বারবার আবর্তিত হতে থাকে।

✵ মায়ামুক্তির কারণ কে– মায়া নাকি মায়াধীশ?

দেবী দুর্গা ভগবানের মায়াশক্তি, আর ভগবান সেই মায়ার অধীশ্বর (পূর্বে আলোচনা হয়েছে)। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় মায়াধীশ। এখন প্রশ্ন হলো, মায়ার বন্ধন থেকে জীবের মুক্তিদানকারী কে– মায়া, নাকি মায়াধীশ পরমব্রহ্ম।

যে মাঝসমুদ্রে পতিত হয়েছে, সে অতি দক্ষ সাতারু হলেও কেবল স্বচেষ্টায় সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। তা সম্ভব হবে কেবল তখনই, যখন অন্য কেউ তাকে সেখান থেকে তুলে নেবে। একইভাবে এ জড়জগৎকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যাকে বলা হয় ভবসমুদ্র। এখানে জীবসকল মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। কেবল নিজ চেষ্টায় কেউ এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভগবদ্গীতায় (৭.১৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– ***মমমায়া দূরত্যয়া।*** *অর্থাৎ আমার মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।* জগদ্বিদিত দেবীদুর্গাই সেই মহামায়া। সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে সমুদ্র কখনো উদ্ধার করতে পারে না, তথাপি পতিত ব্যক্তিকে যখন অপর কেউ সমুদ্র থেকে তুলে আনে, তখন বলা যেতে পারে যে, "সমুদ্র তাকে ফিরিয়ে দিল

বা মুক্ত করল"। এদিক থেকে সমুদ্রকেও মুক্তিদাতা বলা যায়, তবে তা আপেক্ষিক সত্য, পরম সত্য নয়। তেমনি, মায়ারূপ ভবসমুদ্র থেকে মায়া কখনো জীবকে মুক্তিদান করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানই হলেন মূল মুক্তি প্রদাতা। আরেকটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

এ জড়জগৎকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জেলারের নির্দেশে কারারক্ষী কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে কয়েদিকে বলতে পারে, 'যাও তোমাকে মুক্ত করে দিলাম', কয়েদিও বলতে পারে, "কারারক্ষী আমাকে মুক্ত করে দিল"। কিন্তু তা আপেক্ষিক সত্য। প্রকৃতসত্য এটাই যে, তাকে মুক্তি দিলেন জেলার। তেমনি, মায়াশক্তি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা ব্যতীত শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না, সেহেতু মায়াশক্তিকে মুক্তিদায়িনী বা মোক্ষদা বলা হলেও তা আপেক্ষিক সত্য। পরমসত্য সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন– ***মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ (ভ.গী.৭.১৪)।*** "যখন কেউ আমার শরণাপন্ন হন, তখন তিনি এ মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তখন সমস্ত দেবদেবী তার প্রতি প্রসন্ন হন (পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। সুতরাং, মহামায়া দেবীদুর্গাও এভাবে যখন ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তিনি যোগমায়ারূপে ভগবানের ইচ্ছায় জীবকে মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত করে ভগবানকে জানতে সাহায্য করেন, যেন জীব জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারে। এ অর্থে দুর্গাকে কখনো কখনো মুক্তির কারণ বলা হয়; কিন্তু মূল কারণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মুক্তিপ্রদাতা বলে মুকুন্দ নামে খ্যাত। তাই বেদে ধ্বনিত হয়েছে– ***বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥শ্বেতাশ্বতর ৫.১৩॥*** "যিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপৃত আছেন, সেই পরমেশ্বরকে অবহিত হয়ে জীবাত্মা সকল বন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।"

✵ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে দেবীদুর্গার প্রকৃত সম্পর্ক

দেবী দুর্গা সম্পর্কে ব্রহ্মসংহিতায় (৫.৪৪) বলা হয়েছে–

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী

মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

আবার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্য আরো স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। গঙ্গাতটে বালিকাদের বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো করতে দেখে মহাপ্রভু তাদের বলেন–

কন্যারে কহে– 'আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা– দাসী মোর, মহেশ– কিঙ্কর ॥
(চৈ.চ.আদি. ১৪.৫০)

এখানে ভগবান বলছেন, "আমার পূজা করো, আমি তোমাদের বর প্রদান করব। গঙ্গা ও দুর্গা আমার দাসী। অন্যান্য দেবতাদের কি কথা, এমনকি দেবাদিদেব শিবও আমার কিঙ্কর (দাস)।"

এছাড়া, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা থেকে জানা যায় যে, মায়াশক্তি দুর্গাদেবী হলেন প্রভু শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনকারী সেবিকা এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনি এ জড়জগৎরূপ দুর্গের পরিচালনা করেন।

✵ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে দেবীদুর্গা

আমরা ইতোমধ্যে ভগবানের দুই প্রকার মায়াশক্তির কথা আলোচনা করেছি– মহামায়া এবং যোগমায়া। এজগতে অধিকাংশ মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরূপে দুর্গার আরাধনা করে থাকে। যোগমায়া সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই সীমিত।

দ্বাপরযুগে এ ভূতলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে যোগমায়া তাঁর ভগিনীরূপে প্রকাশিত হন। এর বহুকাল পূর্বে, সত্যযুগে দেবতাদের প্রার্থনায় দেবীদুর্গা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে তাঁর আবির্ভাব প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১১.৪০-৪২) দুর্গার সেই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রয়েছে–

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিতমে যুগে। (৪১)
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২॥

"বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশতম চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব এবং বিন্ধ্যাচলবাসিনী নামে অসুরদ্বয়কে বিনাশ করব।" দতশ্রীমদ্ভাগবতে এ প্রসঙ্গে চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবির্ভাবের পূর্বেই যোগমায়াকে নির্দেশ দেন। ভগবান বলেন–

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ (ভা.১০.২.৯)

"হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া, আমি তখন আমার পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যসহ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবো এবং তুমিও তখন নন্দপত্নী যশোদা মাতার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে।"

কংসের কারাগারে দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন এবং তারপর তিনি একটি ছোট্ট শিশুরূপ ধারণ করেন। ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সেখান থেকে গোকুলে নন্দালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেসময় ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া নন্দমহারাজের পত্নী যশোদার কন্যারূপে প্রকাশিত হন–

যা যোগমায়া নন্দজায়য়া ॥ (ভাগবত ১০.৩.৪৭)
তাবদ্ব্রজে নন্দপত্ন্যাং যোগমায়াজনি স্বতঃ ॥
(গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড, ১১.৪৩)
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরেতদ্বদ্ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৫.২.৩)

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে যোগমায়াকে 'যোগনিদ্রা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, যোগমায়াও সেসময় *যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা*– পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হলেন। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ৫৭ ও ৫৮তম অধ্যায়েও এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তাই মহাভারতেও (ভীষ্মপর্ব, ২৩.৭) দুর্গাকে *'গোপেন্দ্রস্যানুজে', 'নন্দগোপকুলোদ্ভবে'* নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

শিশুকৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে বসুদেব সেই কন্যাটিকে কংসের কারাগারে নিয়ে আসেন। তখন দেবকীর অষ্টম সন্তান হয়েছে জানতে পেরে কংস সূতিকাগৃহে এসে সেই শিশু কন্যাটিকে হত্যা করার অভিলাষে দেবকীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল এবং তাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যেহেতু সেই কন্যাটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগিনী যোগমায়া, তাই তিনি কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন।

সায়ুধাষ্টভুজা মায়া পার্ষদৈঃ পরিসেবিতা।
(গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড, ১১.৫৮)
সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥৯॥
(ভাগবত ১০.৪.৯)

এখানে *অনুজা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগমায়া দুর্গা যেমন নন্দযশোদাকে পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছেন, কৃষ্ণও তেমনি তাঁদের পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছেন। তাই যোগমায়া দুর্গাকে ভগবানের অনুজা বা কনিষ্ঠা ভগিনী বলা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড (১.১৩৭) অনুসারেও – *দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী ॥*

দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা ॥১০॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তুয়মানেদমব্রবীৎ ॥১১॥
ভাগবত ১০.৪.১০-১১

দুর্গাদেবী ফুলের মালা, চন্দন, সুন্দর বসন এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হস্তে ধনুক, বাণ, ঢাল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছিলেন এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি স্বর্গলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন।

যোগমায়া ভগবতী বহুনামা বভূব হ ॥
(গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড, ১১.৬০)
ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ (ভা. ১০.৪.১৩)

"এই দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হয়েছিলেন।"

অতএব, অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, গর্গসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত এবং এমনকি শাক্তদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে, বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশতম চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-শক্তি দুর্গা তাঁর ভগিনীরূপে আবির্ভূত হন।

উল্লেখ্য যে, এই যোগমায়া পরবর্তীকালে বসুদেবের অন্যপত্নী রোহিণীর কন্যারূপে তথা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ (১.৩৫.৫-৬) ও মহাভারতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রে তার উল্লেখ রয়েছে।

মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রানাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা ॥ (ম.ভা. আদি ২১২.১৭)

মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– "হে পার্থ, এই হলো আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা (সারণের মাতা রোহিণী) এবং আমার পিতার প্রিয়তমা কন্যা; তার নাম সুভদ্রা।" এভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রারূপেও যোগমায়া ভগবানের লীলায়

অংশগ্রহণ করেন। তবে, সুভদ্রারূপে তিনি বিশেষত ভক্তিস্বরূপা, কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। তাই বৈষ্ণবগণের নিকট জগন্নাথ (কৃষ্ণ) এবং বলদেব (বলরাম)-এর সঙ্গে সুভদ্রারূপেই যোগমায়া নিত্য পূজিত হন।

মূলত, শ্রীকৃষ্ণের এক চিন্ময় শক্তিই অবস্থাভেদে তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্ধারিত সেবা অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। কখনো যোগমায়া, কখনো মহামায়া, আবার, কখনো ভক্তিস্বরূপা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (১.১৩৩) ভগবানের প্রকৃতি বা শক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে 'সুভদ্রা'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "জড়জগতে যে শক্তি কাজ করে তা হলো 'ভদ্রা' এবং চিন্ময় জগতে এই একই শক্তিকে বলা হয় 'সুভদ্রা'।" (উপেন্দ্রকে পত্র, ৫ জুলাই, ১৯৬৯)। অর্থাৎ, সুভদ্রা হলো অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎশক্তি, যিনি যোগমায়ারূপে ক্রিয়া করেন এবং ভগবানের আজ্ঞানুসারে সেই একই শক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হিসেবে দুর্গারূপে জড়জগৎ পরিচালনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "সুভদ্রা হলেন যোগমায়া। যোগমায়াকে চিন্ময়শক্তি বলা হয় এবং যোগমায়ার ১৬টি প্রকৃতি রয়েছে। আর এই ১৬টি প্রকৃতির মধ্যে একটি হলো সুভদ্রা। মহামায়া মূলত জড়শক্তি, যা যোগমায়া শক্তিরই অন্তর্গত। এবং যোগমায়া ও মহামায়া উভয়ই কৃষ্ণের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণশক্তি।" (মধুসূদনকে পত্র, মন্ট্রিয়েল, ২৯ জুলাই, ১৯৬৮)

❋ পরম বৈষ্ণবীরূপে দেবীদুর্গা

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে–

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

"যে দেবী সর্বভূতে (সর্বজীবে) বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা হন, তাঁকে বারংবার নমস্কার।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গা সম্পর্কে (৫৭/২১) বলা হয়েছে–

বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা ॥

"যিনি বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা এবং বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী, বিষ্ণুকর্তৃক সৃষ্টিকালে সৃষ্টা হন, তিনিই বৈষ্ণবীরূপে আহূতা হন।" অর্থাৎ, তিনি বিষ্ণুর শক্তি ও বিষ্ণুর পরম ভক্ত হবার কারণে তাঁকে বৈষ্ণবী বলা হয়।

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ (ব্র. বৈ.পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ২.৭২)

অর্থাৎ, "ভগবানের এ মায়াশক্তি বৈষ্ণবগণকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবী (তথা কৃষ্ণভক্ত)।"

বিষ্ণুপুরাণে *(বিষ্ণুপুরাণ ৫.১.৭০) –যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।* এছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও (১১.৫) দেবীদুর্গাকে বৈষ্ণবী বলা হয়েছে–

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্তবীর্যা।
বিশ্ববীজস্য পরমাসি মায়া"।

আবার, তাঁকে পরমা প্রকৃতি বলা হয়, কারণ তিনি পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের প্রকৃতি। নারায়ণের প্রকৃতি বলেই তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর বহু শ্লোকে নারায়ণী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। এখানে লক্ষণীয়, যদি শিবই পরম পুরুষ হতেন, তাহলে পরমাপ্রকৃতিকে নারায়ণী না বলে শিবানী নামের আধিক্য থাকতো। এমনকি দেবীর প্রণামমন্ত্রেও আমরা দেখি–

'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমঃহস্তুতে।'

যারা দুর্গা পূজা করেন, তারা জানেন কতবার দেবীর মন্ত্রে তাঁকে নারায়ণী বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ভারতের কাশ্মীরের হিমালয়ে ত্রিকূট পর্বতের গুহায় দেবী দুর্গার অতি প্রসিদ্ধ এক মন্দির হলো বৈষ্ণোদেবীর মন্দির, যেখানে দেবী দুর্গা বৈষ্ণবী নামে খ্যাত। এখানে দেবীর এরূপ নামকরণের কারণ, এখানে দেবী দুর্গা বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের ধ্যানে রত রয়েছেন। দেবীর ধ্যানে যেন বিঘ্ন না হয়, সেজন্য প্রভু শ্রীরামের পরমভক্ত হনুমানজি সর্বদা সেখানে অবস্থান করেন। নবরাত্রি পূজার সময় সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ শক্তি উপাসকগণ দেবী মায়ের দর্শনার্থে সেখানে সমবেত হন।

সুতরাং, দেবীদুর্গা বৈষ্ণবী অর্থে তিনি যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত, তথা সেবিকা, তা জগদ্বিদিত।

❋ ত্রিগুণময়ী দেবীদুর্গা

দেবীদুর্গা ত্রিগুণের দ্বারা কীভাবে জীবকে আবদ্ধ করেন?

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, দেবী দুর্গা হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তির প্রকাশ। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছি বিধায় শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য সত্ত্ব, রজো ও তম–এ তিনগুণের দ্বারা এ জড়জগৎরূপ দুর্গ বা কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

এখানে গুণ বলতে বোঝায় রজ্জু বা দড়ি। পশুদের যেমন রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, পুতুল নাচে যেরূপ সুতা দ্বারা পুতুলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তেমনি এ ত্রিগুণ দ্বারা দেবী দুর্গা বা জড়াপ্রকৃতি প্রতিটি জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪.৫) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

"হে মহাবাহো (অর্জুন), জড়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজো ও তম– এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে রাখে।"

আবার, এ তিনটি গুণকে প্রকৃতির তিনটি মৌলিক রঙের সঙ্গে তুলনা করা যায়– লাল, নীল ও হলুদ (অথবা সাদা, লাল, কালো)। ***অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ ॥শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ৪.৫॥*** এ তিনটি রং একটি আরেকটির সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণের ফলে যেমন অসংখ্য রং সৃষ্টি করে, তেমনি বিভিন্ন মাত্রায় এ তিনগুণের উপস্থিতি বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি করে। আর এ কারণে জীবদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

১. সত্ত্বগুণ

এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার ফলে প্রকাশকারী ও পাপশূন্য এবং সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

জীব যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করেন যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং অন্যদের থেকে শ্রেয়। এভাবেই তিনি জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সে সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের গর্বে মত্ত এবং যেহেতু তাঁরা সাধারণত তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলেন, তাই তাঁরা এক ধরনের জড়সুখ অনুভব করেন।

বদ্ধ জীবনের এই উন্নত সুখানুভূতি তাঁদের জড়াপ্রকৃতির সত্ত্বগুণের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। তাই তাঁরা সত্ত্বগুণে কর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই কর্ম করার দিকে তাঁদের আকর্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাঁদের প্রকৃতির গুণজাত কোনো একটি জড়দেহ ধারণ করতেই হয়। তাই, মুক্তি লাভ করে চিদ্জগতে প্রবেশ করবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁরা হয়ত দার্শনিক, বিজ্ঞানী বা কবি হয়ে বারবার জন্মাতে পারেন, তবু জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশদায়ক বন্ধনে তাঁদের বারবার আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু জড়া প্রকৃতির তথা মহামায়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, সেধরনের জীবনযাত্রা সুখদায়ক। এভাবে দেবী দুর্গা সত্ত্বগুণের দ্বারা জীবকে দুর্গতি দান করেন।

২. রজোগুণ

রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং তা তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেই রজোগুণই জীবকে সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে।

রজোগুণ বর্ধিত হলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম ও দুর্দমনীয় স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। রজোগুণের বৈশিষ্ট হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। পুরুষের প্রতি স্ত্রী আকৃষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয়। এটা রজোগুণেরই বহিঃপ্রকাশ।

মানুষের মধ্যে যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়, তখন তার জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। তখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য রজোগুণে অধিষ্ঠিত মানুষ সমাজে অথবা জাতিতে প্রতিষ্ঠা কামনা করে। এগুলো হচ্ছে রজোগুণের প্রভাব। মানুষ যখন এসব আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই, এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্ত্রী, পুত্র ও সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তার সম্মান বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং, সমস্ত জড়জগৎটিই প্রায় রজোগুণে অধিষ্ঠিত। আধুনিক সভ্যতাকে রজোগুণের পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নত বলে গণ্য করা হয়। পুরাকালে সত্ত্বগুণের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতির মান নির্ণয় করা হতো। যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাই যদি মুক্তিলাভ করতে না পারেন, তাহলে যারা রজোগুণের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের কী কথা!

৩. তমোগুণ

অজ্ঞানজাত তমোগুণ সমস্ত জীবের মোহনকারী, যা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তমোগুণ বর্ধিত হলে অজ্ঞান-অন্ধকার, নিষ্ক্রিয়তা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ দেহধারী আত্মার অতি অদ্ভুত একটি গুণ। সত্ত্বগুণে জ্ঞান অনুশীলনের ফলে জানতে পারা যায় কোনটি কী, কিন্তু তমোগুণ হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন সকলেই উন্মাদ এবং যে উন্মাদ, সে বুঝতে পারে না কোনটি কী। উন্নতি সাধন করার পরিবর্তে সে অধঃপতিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে তমোগুণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *বস্তুযথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ* – অর্থাৎ, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারা যায় না। যেমন, প্রত্যেকেই জানে যে, তার পিতামহ মারা গেছেন (অথবা মারা যাবেন) এবং তাই সেও একদিন মারা যাবে, কারণ মানুষ মরণশীল। তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিরাও একদিন মারা যাবে। সুতরাং, সকলেরই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তবুও মানুষ তার সনাতন আত্মাকে উপেক্ষা করে উন্মাদের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছে। এটিই হচ্ছে উন্মত্ততা। তাদের এই উন্মত্ততার ফলে তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রতি অত্যন্ত নিস্পৃহ। এ ধরনের মানুষ অত্যন্ত অলস। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যখন তাদের সাধুসঙ্গ করতে আহ্বান করা

হয়, তখন তারা তাতে খুব একটা উৎসাহী হয় না। তারা এমনকি রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত মানুষদের মতোও ততটা সক্রিয় নয়। এভাবেই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষদের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তারা যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি ঘুমায়। ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট, কিন্তু তমোগুণে আচ্ছন্ন যে মানুষ, সে কমপক্ষে দশ থেকে বারো ঘণ্টা ঘুমায়। এধরনের মানুষ সর্বদাই বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং তারা মাদকদ্রব্য ও নিদ্রার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এগুলো হচ্ছে তমোগুণের দ্বারা আবদ্ধ মানুষের লক্ষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৪.৯) অনুসারে,

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারতঃ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রসাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে সকাম কর্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধ্বে উচ্চতর লোকে গমন করে, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে নরলোকে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে অথবা পশুযোনিতে জন্ম হয়। কিন্তু দেবীদুর্গা কর্তৃক ত্রিগুণে আবদ্ধ কেউই (উর্ধ্ব-মধ্য-অধঃ) ত্রিলোকের বাইরে অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে পারে না।

তাই, যিনি কৃষ্ণভাবনার পথে উন্নতি সাধন করতে সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে এই তিনটি গুণই অতিক্রম করতে হবে। মানুষের আচরণে, তার কার্যকলাপে, আহার-বিহার আদিতে কোনো না কোনো গুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এভাবে ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ করে দেবীদুর্গা জীবকে জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করে তাদের দুর্গতি প্রদান করেন।

ত্রিতাপ ক্লেশদায়িনীরূপে দেবীদুর্গা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীবের তিন প্রকার ক্লেশের কথা বলা হয়েছে। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে যেরূপ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন, তদ্রূপ আসুরিকভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আধি-আত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক– এ তিন প্রকার ক্লেশ প্রদান করেন; যার প্রতীকরূপে দেবী দুর্গার হাতে ত্রিশূল দেখা যায়। এভাবে তিনি আমাদের দুর্গতি প্রদান করছেন।

আধ্যাত্মিক ক্লেশ

জড়দেহ ও মন থেকে উৎপন্ন দুঃখ, যেমন : ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-ভয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, মানসিক যন্ত্রণা-উদ্বেগ ইত্যাদি।

আধিভৌতিক ক্লেশ

অন্য কোনো জীবের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ; যেমন : বিভিন্ন রোগজীবাণু, মশা-মাছি-ছাড়পোকা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদির কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ। এছাড়া, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, হ্যাকিং, যুদ্ধ-বিবাদ, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, হানাহানি, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি।

আধিদৈবিক ক্লেশ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষ যে ক্লেশ পেয়ে থাকে; যেমন : ঝড়-তুফান, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, খড়া-বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, অত্যধিক গরম, অত্যধিক ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

এছাড়া, জন্ম, মৃত্যু, জরা (বার্ধক্য) ও ব্যাধি – জীবের এ চার প্রকার প্রধান দুঃখ দেবীদুর্গাই প্রদান করে থাকেন।

দুর্গতিনাশিনীরূপে দেবীদুর্গা

তবে কি দেবী দুর্গা আমাদের কেবল দুঃখই প্রদান করেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন আমরা তাঁর পূজা করি? না, দেবী দুর্গা আমাদের দুঃখ এবং সুখ উভয়ই প্রদান করেন। জেলার যেমন কয়েদীকে দুঃখ দানের মাধ্যমে সংশোধন করেন এবং কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন, তেমনি বদ্ধজীবদের দুঃখ দানের মাধ্যমে দুর্গাদেবী জীবকে পাপের ফল ভোগ করান এবং প্রতিনিয়ত দুঃখ পাওয়ার ফলে জীব এ জগৎ যে দুঃখালয় ও অশাশ্বত তা অনুভব করে। এভাবে কর্মফল ভোগের মাধ্যমে জীব ধীরে ধীরে দুঃখময় জগৎ থেকে মুক্তির দিকে অগ্রসর হতে উদ্যোগী হয়; যার চরম ফলস্বরূপ জীব পরম সুখ প্রাপ্ত হয়। তাই দেবী দুর্গা দুঃখদানের মাধ্যমেও দুর্গতিনাশই করেন। এ কারণে দুঃখ দানও তাঁর কৃপা।

দেবীদুর্গার দুই প্রকার কৃপা

সকামকর্মী বা জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত এজগতের সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি অথবা সুখ-ঐশ্বর্য লাভের আশায় দুর্গাদি দেবদেবীর আরাধনা করে থাকে। কিন্তু তারা জানে না যে, বদ্ধজীবের প্রতি দেবী দুর্গার দুই প্রকার কৃপা:

১. কপট কৃপা

২. অকপট কৃপা।

সকপট কৃপাস্বরূপ দেবী মায়ামুগ্ধ জীবদের বাঞ্ছিত ধন, জন, রূপ, যশ ও অষ্টসিদ্ধি

আদি অনিত্য জড় বিষয় প্রদান করে মায়া দ্বারা মোহিত করে রাখেন। অপরপক্ষে, যারা মায়ামুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী, তাদের প্রতি অকপট বা নিষ্কপট কৃপাস্বরূপ তিনি তাদের কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন।

চৈতন্য ভাগবতে (মধ্যখণ্ড ১৬৬.১৭০) মহাপ্রভু যখন দেবী দুর্গার আবেশ নেন, তখন ভক্তগণ দেবীর স্তুতি করে বলেন–

'জগৎস্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।

তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা তুমি বিষ্ণুভক্তি'।

দেবীভক্তদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আদ্যাস্তোত্রেও বলা হয়েছে– *'বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা, সুখদা মোক্ষদা সদা'*–অর্থাৎ, দেবী দুর্গা বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী, যে ভক্তিবলে আত্যন্তিক সুখ ও পরম মুক্তি লাভ হয়। তাই, বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্তি দান করাটাই দেবীর কৃপার চরম পর্যায়।

এভাবে, দেবীদুর্গা একদিকে অনিত্য জড় সুখ ও দুঃখ দানের মাধ্যমে জীবকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন এবং অন্যদিকে তিনিই আমাদের এ দুর্গতি নাশ করে, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধামে ফিরে যেতে সহায়তা করেন। তাই তিনি একইসঙ্গে দুর্গতিদায়িনী এবং দুর্গতিনাশিনী।

অতএব, দুর্গাদেবীর প্রত্যেক পূজকের উচিত তাঁর নিকট জড়জাগতিক সুখ-সুবিধা কামনা না করে, কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য তথা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্যই তাঁর পূজা করা; যার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত সুখ লাভ হয়।

❋ সৃষ্টির মূল কারণ শক্তি নয়, শক্তিমান

সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে প্রধানত দু'রকমের মতবাদ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবান থেকে এই জড়জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট এবং মুখ্যভাবে চিৎজগতের প্রকাশ, যা হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক এবং তাঁর স্বীয় ধাম গোলক বৃন্দাবন। পক্ষান্তরে ভগবানের সৃষ্টির দুটি প্রকাশ–জড়-জগৎ ও চিৎ-জগৎ। জড়জগতে যেমন অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, চিৎ-জগতেও তেমন গোলোক, বৈকুণ্ঠ আদি অসংখ্য চিন্ময় লোক রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান জড়-জগৎ ও চিৎ-জগৎ উভয়েরই কারণ। অপর মতবাদটি হচ্ছে যে, এক অব্যক্ত অপ্রকাশ শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেননা শূন্য থেকে কোনোকিছু সৃষ্টি হয় না। নাস্তিক্যবাদের সে নিরর্থক আলোচনায় আমরা যাব না। আবার, শাক্তরা মনে করেন শক্তিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ।

প্রথম মতটি বেদান্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় মতটি বেদান্ত সিদ্ধান্তের

বিরোধী সাংখ্য স্মৃতি নামক নাস্তিক মতবাদ। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা কোনোরকম চিন্ময় বস্তুকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করতে পারেন না। এ ধরনের নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করেন যে, অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে জীবনীশক্তি ও চেতনার লক্ষণ দেখা যায়, তা প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে উৎপন্ন। এভাবেই সাংখ্য মতাবলম্বীরা সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী।

বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত শক্তি যাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেই পরম পুরুষের শক্তি থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি। যেসমস্ত দার্শনিক জড়সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে কল্পনার দ্বারা এক-একটি মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরা কেবল জড় শক্তির চমৎকারিত্বই উপলব্ধি করেন। এই ধরনের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, ভগবানও জড় শক্তিসম্ভূত। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিমানও শক্তিজাত। এই ধরনের দার্শনিকেরা ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, এই জগতের সমস্ত জীব জড় শক্তি থেকে উদ্ভূত। এতএব পরম চৈতন্যময় পুরুষও নিশ্চয়ই জড় শক্তিসম্ভূত।

কিন্তু আমরা প্রথমেই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও শ্রুতিশাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেছি যে, শক্তি হলো পরমব্রহ্মের কার্যক্ষমতা এবং তাঁর এ শক্তি স্বাভাবিকী, যা তাঁর মধ্যে নিত্য বর্তমান। যে বস্তু যার মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান, তার উৎপত্তি সেই বস্তু থেকে হতে পারে না। যেমন, সূর্যালোক সূর্যের শক্তি, যা সূর্যের মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান। তাই আলোকশক্তি থেকে সূর্যের সৃষ্টি হতে পারে না। তেমনি, শক্তি থেকে পরব্রহ্মের উৎপত্তি হয়নি, বরং শক্তিই পরব্রহ্মের অধীন তত্ত্ব।

তাই শ্রুতিমন্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর ৬.১৬) পরমব্রহ্মকে 'আত্মযোনি', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ংই নিজের প্রাকট্যের হেতু, তাঁর প্রাকট্যের অন্য কোনো কারণ নেই এবং তিনি প্রধানের তথা প্রকৃতির এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তথা জীবাত্মাসমূহের অধিপতি।

সুতরাং, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন– সে অর্থে বহিরঙ্গা শক্তি বা প্রকৃতিকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ বলা হলেও তার মূলে রয়েছেন সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান। তাই পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডে (২২৭.৫০-৫২) বলা হয়েছে– *সা সর্বজগদাধারা প্রকৃতির্হরিসংশ্রিতা॥৫০॥ তয়া জগৎসর্গলয়ৌ করোতি ভগবান্ সদা। ক্রীড়ার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা মায়া জন্ময়ী॥৫১॥ অবিদ্যা প্রকৃতির্মায়া গুণত্রয়মযী সদা॥৫২॥* অর্থাৎ, "সেই প্রকৃতি সর্বজগতের আধারভূতা হরির আশ্রয়রূপা, ভগবান তাঁরই সহিত সর্বদা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিধান করে থাকেন। দেবদেব হরি ক্রীড়া করার জন্য যে মায়া সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবিদ্যা, প্রকৃতি ও মায়া এবং ত্রিগুণময়ী।"

কেননা, বৈদিকশাস্ত্র অনুসারে এ জড়জগৎ হলো ভগবানের মায়াশক্তির প্রকাশ এবং

সেই শক্তি বা জড়াপ্রকৃতি জড়রূপা বা অচেতন। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবানের সেই শক্তিকে অপরা বা নিকৃষ্টা বলা হয়েছে। জড়বস্তু কখনো আপনাথেকে কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, অচেতন ইটগুলো নিজে নিজেই একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারে না। তার জন্য চেতন ব্যক্তির প্রয়োজন। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জড়া প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে (মায়াশক্তিকেও) পরিচালনের জন্য অবশ্যই একজন কর্তা রয়েছেন। আর সেই মূল কর্তা হলেন পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান। ভগবদ্গীতায় (৯.১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরঃ*- অর্থাৎ, ভগবানের অধ্যক্ষতায় জড়াপ্রকৃতি এ চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। অতএব, পরমেশ্বর ভগবানই জড়সৃষ্টির মূল কারণ। তাই ভগবান বলেছেন- *অহং সর্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। (ভ.গী. ১০.৮)* /" জড় ও চেতন জগতের সবকিছু আমার থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।"

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ। ভা. ১.৫.২০

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তবু তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই জগৎ বর্তমান এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়।

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গণময্যাগুণা বিভুঃ ॥ (ভা. ১.২.৩০)

"এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।"

শাক্তরা বলেন, শক্তি থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি হয়েছে। একথা মিথ্যা নয়, যেহেতু শক্তিমান ভগবান তাঁর শক্তি দ্বারাই কার্য করেন। তাই ভগবানই মূল কর্তা। শ্রুতিশাস্ত্রেও সেকথা বলা হয়েছে- প্রশ্নোপনিষদে (৬.৩) *স ঈক্ষাঞ্চক্রে ॥* তিনি ইক্ষণ করলেন। *স প্রাণমসৃজত* (৬.৪)- তিনি প্রাণের সৃষ্টি করলেন। *তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥* (ছান্দোগ্য ৬.২.৩)। সৃষ্টির সঙ্কল্প করে পরব্রহ্ম মায়ার প্রতি ইক্ষণ বা দৃষ্টিপাত (তদ্ ঐক্ষত) করলেন। এই দৃষ্টিপাতের দ্বারাই তিনি সাম্যাবস্থাসম্পন্ন প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করে থাকেন, যার প্রভাবে মায়া জগতের সৃষ্টি আদি করে থাকে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৫.৫৯-৬১) বলা হয়েছে-

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তিসঞ্চারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজোগলস্তন ॥

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানরূপে প্রধান বা প্রকৃতি নামে পরিচিত এবং জগতের নিমিত্ত অংশে মায়া নামে পরিচিত। জড়রূপা প্রকৃতি জড়জগতের প্রকৃত কারণ নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সমস্ত উপাদানগুলোকে সক্রিয় করেন। এভাবেই জড়া প্রকৃতি সমস্ত উপাদান সরবরাহ করার শক্তি লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, লোহার যেমন দহন করার বা তাপ প্রদান করার শক্তি নেই, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত লোহা অন্য বস্তুকে দহন করতে ও তাপ দিতে সমর্থ হয়। জড়াপ্রকৃতি লোহার মতো, কেননা, শ্রীবিষ্ণুর সংস্পর্শ ছাড়া তার কার্য করার কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। কিন্তু কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত হলেই প্রকৃতি জড়সৃষ্টির উপাদানগুলো সরবরাহ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৮/৪০) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন-

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

"যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও স্ফুলিঙ্গ একত্রে অগ্নির উপাদান, কিন্তু তা হলেও জ্বলন্ত কাষ্ঠ আগুন থেকে ভিন্ন এবং ধূম জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে ভিন্ন।" পঞ্চ-মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) ধূমের মতো, জীব স্ফুলিঙ্গের মতো এবং প্রধানরূপে প্রকৃতি জ্বলন্ত কাষ্ঠের মতো। তারা সকলে ভগবানের থেকে শক্তি লাভ করেই স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সৃষ্টির মূল। জড়া প্রকৃতির কোনকিছু সরবরাহ করার ক্ষমতা তখনই থাকে, যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা সক্রিয় হয়।

পুরুষের বীর্য গর্ভে সঞ্চার হওয়ার ফলেই স্ত্রী যেমন সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তেমনই মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলেই জড়া প্রকৃতির জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। তাই, পরমেশ্বর ভগবান জীবসকলের পরমপিতা। আর মহামায়া দেবীদুর্গা আমাদের মাতৃস্বরূপা বা জগন্মাতা। তাই প্রধান বা প্রকৃতি (বা শক্তি) কখনোই পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলা হয়েছে- *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। প্রকৃতি বা সমগ্র জড়শক্তি ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করে। সমস্ত জড় উপাদানগুলোর উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

তাই নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জড়া প্রকৃতিকেই এই সমস্ত উপাদানগুলির উৎস বলে মনে করে, তা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত। তা অনেকটা ছাগলের গলায় স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড থেকে দুধ দোহন করার প্রচেষ্টার মতো।

পরমেশ্বর ভগবানই যে সৃষ্টির মূল বেদান্তসূত্রেও সেকথা বলা হয়েছে- ***ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ (ব্রহ্মসূত্র ১.১.৫)***। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও অনুরূপ কথাই বলেছেন। সুতরাং, মায়ার (দুর্গার) জগৎকর্তৃত্ব গৌণ, পরব্রহ্মের শক্তিতেই মায়ার কর্তৃত্ব। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্যে পরব্রহ্মের কর্তৃত্বই মুখ্য। তাই বেদান্তসূত্রে বলা হয়েছে-*জন্মাদ্যস্য যতঃ (১.১.২)*- পরমেশ্বর ভগবানই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ।

✵ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত দুর্গাতত্ত্ব

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে লীলাবিলাসকালে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে ভক্তদের সাথে নাটকাভিনয় লীলা করতেন। ভক্তগণ লীলায় আবেশ অনুযায়ী একেক সময় একেক ভাব ও চরিত্রে অভিনয় করতেন। একদিন মহাপ্রভু জগজ্জননী আবেশে বিষ্ণুখট্টার উপর বসে ভক্তদের স্তুতি পাঠ করতে বলেন। তখন ভক্তগণ কেউ নারায়ণী-লক্ষ্মী, কেউবা চণ্ডীর স্তুতি পাঠ করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৬৬ থেকে ১৮৩ শ্লোক পর্যন্ত সেই মহিমা কীর্তিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হলো-

জয় জয় জগত জননী মহামায়া।

দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা পদছায়া ॥

এখানে জগজ্জননী বলতে জগতের অর্থাৎ জগদ্বাসী জীবের সম্বন্ধে ভাবময়ী (বাৎসল্যময়ী) বোঝানো হচ্ছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীখণ্ডে চণ্ডীদেবীকে বহুস্থলে মহামায়া বলা হয়েছে। যথা- ***মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা ॥ ৮১/৫৪ মহামায়া হরেশ্চৈত তয়া সংমোহ্যতে জগৎ। জ্ঞানিনামপি চেতাংশি দেবী ভাগবতী হি সা ॥৮১/৫৫॥***

শ্রীহরির এই মহামায়া-শক্তি দ্বারাই অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীবগণ সম্যকরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়ে আছে। *কৃষ্ণভুলি যেই জীব অনাদিবহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুখ ॥* মায়া অপসারিত না হলে জীবের সংসার দুঃখ এবং অনাদি বহির্মুখতাও ঘুচতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত তা যে সম্ভবপর নয়, তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন- ***দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥গীতা ৭/১৪॥*** অর্থাৎ, "আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।"

দেবী চণ্ডী গুণময়ী হলেও পরম বৈষ্ণবী। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে তাঁকে একাধিক স্থলে

'বৈষ্ণবী' বলা হয়েছে (মা. পু. ৮৮/১৮, ৩৪, ৪৪, ৪৭, ৮৯/৪০, ৯১/৫, ১৩), তাঁর কৃপা হলে মুক্তির হেতুরূপা কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যেতে পারে। যেমন- *সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতু। মা. পু. ৯১/৫*

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী।

তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতারি ॥

দুর্গাদেবী হচ্ছেন অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী। তিনি হচ্ছেন বিষ্ণুশক্তি মায়া। স্বয়ংবিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতাতেই তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন। ***ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম-গীতা ৯১/১০।*** সৃষ্টি করে তিনিই আবার এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য রক্ষা করেন। যেসমস্ত জীব অনাদিবহির্মুখ তথা বিষ্ণু বা কৃষ্ণবিমুখ, মায়া তাদেরই কবলিত করে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে তাদেরই জন্য। সুতরাং, মায়ারূপা চণ্ডীদেবীই হচ্ছেন অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী, তিনিই এই মায়িক বিশ্বের বীজ স্বরূপা, ***যথাঃ ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তসেবৎ ত্বং বৈ প্রসন্নাভুবি মুক্তি হেতু ॥ মা. পু. ৯১/৫।*** অর্থাৎ- তুমি অনন্তবীর্যময়ী বৈষ্ণবীশক্তি। বিশ্বের বীজস্বরূপা। তুমি পরমা মায়াশক্তি। হে দেবী, তুমি এই সমগ্র জগৎ বিমোহিত করে রেখেছ। তুমি প্রসন্না হলে ইহলোকেই মুক্তিপ্রদা হও। এই দেবী যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম রক্ষা করেন। চণ্ডী হতে জানা যায়, অসুরগণ যখন স্বর্গরাজ্য দখল করেছিল, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আত্মরক্ষার জন্য স্বর্গ হতে পলায়ন করেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রাপ্য যজ্ঞাহূতি অসুরগণই গ্রহণ করত, দেবগণ তা পেতেন না। তাতেই লোকের ধর্মহানি হতে লাগলো।

দেবগণের প্রার্থনায় সেসময় দেবী চণ্ডী আবির্ভূত হয়ে অসুরদের সংহার করেন এবং দেবগণ আবার তাঁদের প্রাপ্য যজ্ঞ *হবিঃ* গ্রহণ করতে থাকেন। তাতেই লোকেরা সুরক্ষা পেতে থাকে। এরূপে যখনই অসুরদের উপদ্রপে ধর্মহানি থাকে, তখন দেবী অবতীর্ণ হয়ে অসুরগণের বিনাশপূর্বক ধর্মরক্ষা করতে থাকেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা।

বলিতে না পারে, অন্য কেবা দিবে সীমা ॥

আধিকারিক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবত্রয় তোমার মহিমা সম্যক বর্ণনা করতে সমর্থ নন। সুতরাং অন্য কে তোমার মহিমার সীমা নির্দেশ করতে সমর্থ হবে (অর্থাৎ কেউই সমর্থ নন)। এই দেবত্রয় ত্রিগুণের নিয়ন্তা। তাই, এখানে বিষ্ণু বলতে সত্ত্বগুণের অধিপতি, পালনকর্তা বিষ্ণুর কথা বলা হয়েছে। এই বিষ্ণু বৈকুণ্ঠাধিপতি গুণাতীত বিষ্ণুর অংশসম্ভূত।

জগৎ স্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥

তুমি জগৎস্বরূপা, অর্থাৎ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানরূপা। চণ্ডীদেবীই হচ্ছেন মায়া। এই মায়ায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানস্বরূপা হচ্ছেন মায়া। যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদোক্তি (৪/১০) ***মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম।*** এই চণ্ডী বা মায়াই মায়িক জগতের উপাদানরূপে পরিণত হয়েছেন, সুতরাং তিনি জগৎস্বরূপা। যথা: মা.পু. উক্তি (৮১/৬৪) ***জগন্মূর্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম ॥*** অর্থাৎ, এই জগৎ তাঁর মূর্তি। তাই উপাদান হলেও মায়া কিন্তু জগতের গৌণ উপাদান। মুখ্য উপাদানকারণ এবং মুখ্য নিমিত্তকারণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান; একথা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র হতে জানা যায়। তিনি সমস্ত দেবের শক্তি (শক্তির মূর্ত বিগ্রহ)। যথা: মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তি *(৮৪/৫) দেব্যায়য়া ততমিদমাত্মশক্ত্যা নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।* তিনি শ্রদ্ধা ও লজ্জা। *'শ্রদ্ধাসতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা' (মা.পু. ৮৪/৫)।* তিনি মূর্তিমতি দয়া, পরমদয়াবতী। অসুরদের বিনাশে তাঁর দয়া (দেবগণের প্রতি দয়া) প্রকটিত হয়। তিনি পরমাবৈষ্ণবী বলে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপা।

যত বিদ্যা-সকল তোমার মূর্তিভেদ।
'সর্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥

যতরকম বিদ্যা আছে, সেসব তোমারই বিভিন্নরূপ। *যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ। মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ বিদ্যাসি বা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ (মা.পু. ৮৪/৮)।* অর্থাৎ, হে দেবি, যা মুক্তির হেতু এবং (যম নিয়মাদি) মহাব্রত যার সাধন এবং জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বসার, সমস্ত দোষ বিবর্জিত মোক্ষার্থী মুনিগণ যা অভ্যাস করেন, সেই ভগবতী পরমা বিদ্যা হচ্ছ তুমি। পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে (৮৪/১০) *মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গ ভবসাগরনৌরসঙ্গা। শ্রীকৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা ॥* অর্থাৎ, হে দেবি, যা দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায়, তুমি হচ্ছো সেই। তুমি দুস্তরণীয় ভবসমুদ্র তরণের পক্ষে তরণীস্বরূপা অসঙ্গী দুর্গা। তুমিই শশিমৌলি মহাদেবের কান্তা গৌরী। এই শ্লোক হতে জানা গেল, দেবী চণ্ডী অসঙ্গা (গুণসঙ্গবর্জিতা, মায়াতীতা) দুর্গারূপেই ভবসমুদ্র উত্তরণের পক্ষে তরুণীস্বরূপা। বস্তুত অসঙ্গারূপে, অর্থাৎ গুণসঙ্গবর্জিতা বা মায়াতীতারূপে, তিনি হচ্ছেন মায়াতীত পরব্যোমস্থ সদাশিবের কান্তা। পূর্বোদ্ধৃত ৮৪/৮ শ্লোকে তাঁকে যে পরমা বিদ্যা বলা হয়েছে, তাও 'অসঙ্গা বা মায়াতীত' রূপেই। ত্রিগুণময়ীরূপে তিনি মোক্ষার্থীদের উপাস্যা হতে পারেন না। তিনি যদি গুণময়ী হন, তবে কীভাবে মায়ার ত্রিগুণ থেকে মুক্ত করবেন। পরবর্তী এক শ্লোকে বলা হয়েছে, সমস্ত বিদ্যা হচ্ছে দেবী ভেদ। *'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।' (মা.পু. ৯১/৫)–* হে দেবি, সমস্ত বিদ্যা তোমার ভেদ বা রূপ বিশেষ।

অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, এই দেবী মায়া এবং সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করেছেন *(পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ৯১/৪)।* সুতরাং, এ স্থলে দেবী যে ত্রিগুণময়ী মায়া, তা-ই বোঝা যায়। যেসমস্ত বিদ্যা এই ত্রিগুণময়ী মায়ার ভেদ বা রূপবিশেষ, সে সমস্তও হবে গুণময়ী বা মায়িক বিদ্যা, মায়িক জ্ঞান অর্থাৎ মায়াবদ্ধজীবের দেহ-দৈহিক বস্তুসমন্ধিনি বিদ্যা। অথবা চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র-এই অষ্টাদশবিদ্যা, মুণ্ডকশ্রুতি অনুসারে যাদের অপরাবিদ্যা বলা যায়। বেদ বলেন, হে দেবি, তুমি হচ্ছো মায়ার সর্ববিধ-শক্তিবৈচিত্রী। অনাদিবর্হিমুখ জীবসমূহ হচ্ছে সম্মোহিত করার শক্তি, তাদের দেহে আত্মবুদ্ধি উৎপাদনের শক্তি, দেহ সুখের নিমিত্ত তাদের লুব্ধ করার শক্তি, ইহকালে বা পরকালে দেহসুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাদের যত্নপর করার শক্তি প্রভৃতি মায়ার যতরকম শক্তি বৈচিত্র আছে, তা সবই তুমি, অর্থাৎ, তোমার প্রভাবেই উদ্ভূত। বস্তুত বেদানুসারে, ভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই (যা মায়াতীত ও মায়াস্পর্শশূন্য) তাঁর অন্যান্য শক্তিকে যথোচিতভাবে কার্যসামর্থ্য দিয়ে থাকে। তাঁর মায়াশক্তি হচ্ছে জড়– সুতরাং অচেতন; অচেতন বলে আপনা আপনি কার্য-সামর্থ্যহীন। সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান এই মায়াতে স্বীয় চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত করেন, তাতেই মায়া সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য লাভ করে। সেই চিচ্ছক্তিদ্বারা শক্তিমতী হয়েই মায়া সৃষ্ট জগতের লোকদের মোহপ্রাপ্ত করে থাকে। মায়া হচ্ছে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ- এ ত্রিগুণময়ী, সমস্ত সূক্ষ্মবস্তুও ত্রিগুণময়। ভগবানের চিচ্ছক্তির প্রভাবে জড়রূপা মায়া যে মোহিনীশক্তি লাভ করে, তার প্রভাবেই অনাদিবর্হিমুখ সংসারী জীব স্বরূপত ভগবানের চিদ্রূপা শক্তি হলেও গুণময় দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে থাকে। এ যে তার ভ্রান্তি, তা জীব বুঝতে পারে না, নিজেকেও মায়িক গুণময় মনে করে। মায়ার এ তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ হচ্ছে মুক্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ সাপের পরিত্যক্ত খোলসের ন্যায়, মায়াও হচ্ছে চিচ্ছক্তিরই এক জড়রূপ পরিত্যক্ত অংশ। মায়া হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; ভগবদ্ধামে মায়ার গতি নেই; এমনকি চিন্ময় ধামসমূহ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সীমাস্থানীয় কারণার্ণবকেও মায়া স্পর্শ করতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই মায়ার স্থিতি। কিন্তু চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। ত্রিগুণময়ী চণ্ডী সবরকমের মায়িকীশক্তি বৈচিত্রী (পরন্তু নির্বিশেষ সর্বশক্তি বৈচিত্রী নন)।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা? ॥

হে মাত, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই তুমি পরিপূর্ণভাবে বিরাজিতা; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তোমার স্থান নেই। অথবা ভগবানের শক্তিতে ও তাঁর অধ্যক্ষতায় তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহেই তোমার পরিপূর্ণ মাতৃত্ব। ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে চিন্ময় নিত্য ভগবদ্ধামসমূহ সৃষ্টবস্তু নয় বলে সেসকল স্থানে তোমার সৃষ্টিকারিণীত্ব নেই, সুতরাং মাতৃত্বও নেই।

ত্রিজগতহেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥

হে দেবি, তুমি ত্রিজগতের হেতু, ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী। *হেতু সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। (মা.পু. ৮৪/৬)।* তত্ত্বত মায়ারূপা চণ্ডীদেবী হচ্ছেন পরব্যোমস্থ শিবের কান্তাশক্তি গুণাতীত ভগবতীর অংশ। মায়িক জগতের কার্যের জন্য তিনিই মায়িক গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করে হৈমবতী চণ্ডীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। গুণময়ীরূপে তাঁর উপাসনা করলে তাঁর নিকট ধন-জনাদি গুণময় বস্তু পাওয়া যেতে পারে। গুণাতীতারূপে তাঁর উপাসনা করলে গুণাতীত বস্তু মোক্ষাদি পাওয়া যেতে পারে।

সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥

পূর্ববর্তী পয়ারে বলা হয়েছে, মায়ারূপা চণ্ডীদেবী হচ্ছেন জগৎরূপা। তিনি জগৎস্বরূপা বলেই এই পয়ারে বলা হয়েছে "তুমি সর্বাশ্রয়া"– হে দেবি, তুমি জগদ্বাসী সমস্ত জীবের আশ্রয়, আধার। 'তুমি সর্বজীবের বসতি'। তুমি আদ্যা (প্রথমা) অবিকারা পরমা প্রকৃতি।

সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মূলরূপা প্রথমা শক্তি হচ্ছে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা মায়াশক্তি। মহাপ্রলয়ে মায়ার গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখনই সেই মায়া যাকে (অব্যাকৃতা-অবিকারা বা বিকারহীনা) মায়ারূপা চণ্ডীর এই সাম্যাবস্থা সম্বন্ধেই এই পয়ারে তাঁকে 'অবিকারা' বলা হয়েছে। তত্ত্বত মায়া অবিকারা নয়, যেহেতু এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হচ্ছে ভগবৎশক্তিতে মায়ার বিকার। স্বরূপত মায়ার যদি বিকার ধর্ম না থাকতো, তাহলে ভগবানের চিচ্ছক্তিও তার বিকার ঘটাতে পারতো না; কেননা, কোনো বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম কোনো অবস্থাতেই বিকৃত হতে পারে না।

জগত আধার তুমি দ্বিতীয়া রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব জীব পালয়িতা ॥

হে দেবি, তুমি জগতের (জগদ্‌বাসী জীবের) আধার (আশ্রয়)। পৃথিবীরূপে তুমি সমস্ত জীবের পালনকর্ত্রী। *আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। (মা.পু. ৯১/৩)।* তুমি অদ্বিতীয়া। তোমার দ্বিতীয় স্থানীয় কেউ নেই। দেবী নিজে বলেছেন ***'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মামাপরা। পশৈতা দুষ্ট ময়ৈব বিশন্ত্যো যদ বিভূতয়ঃ' ॥ (মা.পু. ৯০/৩)।*** অর্থাৎ, এই জগতে আমি একাই (এছাড়া যা আছে তা আমার সহায়স্বরূপা) দ্বিতীয় অন্য আর কে আছে? রে দুষ্ট, দেখ আমার এই সমস্ত বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে (শুম্ভ নামক অসুরের প্রতি দেবীর উক্তি)।" এ প্রসঙ্গে মেধা ঋষি বলেছেন– *'ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মানীপ্রমুখালয়ম্। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ (মা.পু. ৯০/৬)।* অর্থাৎ (দেবীর পূর্বোল্লিখিত উক্তির পরে) ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেসমস্ত (চণ্ডীর বিভূতিরূপা) দেবীগণ সেই দেবীর (চণ্ডী দেবীর) শরীরে লয়প্রাপ্ত (বিলীন) হলেন। তখন অম্বিকা (চণ্ডী) একাকিনীই রইলেন। তখন চণ্ডীদেবী অসুর শুম্ভকে বললেন– *অহং বিভুত্যা বহুভিরিহঃ রূপৈর্যদা স্থিতা' তৎসংভৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিয়ো ভব ॥ (মা. পু. ৯০/৫)*– অর্থাৎ স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করে আমি যে বহুরূপে অবস্থান করছিলাম, এক্ষণে সে সমস্তকে উপসংহার করে আমি একাই বিদ্যমান আছি। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।" শুম্ভ নামক অসুরের সাথে যুদ্ধের পূর্বে চণ্ডীদেবী তাঁর বিভূতিরূপা ব্রহ্মাণী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এ সমস্ত বিভূতিরূপা দেবীগণ তাঁর সহায়কারিণীরূপে অন্য অসুরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। শুম্ভের নিকট চণ্ডীদেবী বললেন– "এ যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একাই, আমার সহায়কারিণী দ্বিতীয় কেউই নেই। এই যে ব্রহ্মাণী প্রভৃতিকে দেখছ, এঁরা আমারই বিভূতি, সুতরাং আমার থেকে অভিন্ন, আমার থেকে দ্বিতীয়া বা ভিন্না কেউ নন; তার প্রমাণ দেখ, এক্ষণেই এঁরা আমার মধ্যে প্রবেশ করছেন। তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীর বিভূতি দেবীর সাথে লীন হয়ে গেলেন, দেবী তখন একাই রইলেন। এই বিবরণ থেকে জানা গেল, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীর বিভূতিগণ যে চণ্ডীদেবী হতে ভিন্না বা দ্বিতীয়া নন, তা-ই দেবী জানালেন; স্বরূপতঃ তিনি অদ্বিতীয়া নন।

অদ্বিতীয়া বলতে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদশূন্য তত্ত্বকে-শ্রুতির *একমেবাদ্বিতীয়ম্*– তত্ত্বকেই বুঝায়। সেই তত্ত্ব হচ্ছে সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্ব– পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ, জড়বিপরীত চিৎতত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ড জড় বলে চিৎ হতে বিজাতীয় বস্তু, সুতরাং মনে হতে পারে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু তা সঠিক নয়। এর কারণ দুটি বস্তু যদি পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহলে তাদের একটিকে অপরটির ভেদ বলা যায়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড

জড় হলেও কিন্তু ব্রহ্মনিরপেক্ষ নয়, স্বয়ংসিদ্ধ নয়। কেননা, *আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ১/৪/২৬ ব্রহ্মসূত্র* এবং *তদাত্মানংস্বয়মকুরুত ॥ তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবল্লী-৭।* এ শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায়, পরব্রহ্ম নিজেই নিজেকে এই জগদ্‌রূপে বা জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত করেছেন। *আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ২/১/২৮ ব্রহ্মসূত্র* হতে জানা যায়, নিজেকে জগদ্‌রূপে পরিণত করেও পরব্রহ্ম অবিকারী থাকেন। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃই নির্বিকার, জড়রূপা মায়াই বিকারধর্মিণী। *মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্বান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ শ্বেতা ৪/১০।* এই শ্রুতিবাক্য হতে জানা যায়, জড়রূপা মায়াই হচ্ছে এই জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান।

পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির প্রভাবে জড়রূপা মায়াই জগদ্‌রূপে পরিণত হয়েছে। মায়া হচ্ছে পরব্রহ্মের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ– এই সিদ্ধান্তানুযায়ী পরব্রহ্ম জগদ্‌রূপে পরিণত হয়েছেন বলা হয়েছে। এ আলোচনা হতে জানা গেল, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড পরনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নয়; সুতরাং তত্ত্বের বিচারে পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নয়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তাঁরই মায়াশক্তির বিকার, সুতরাং, বস্তুত তিনিই। আবার, মায়াতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামসমূহ হচ্ছে পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই এক মূর্তরূপ। সুতরাং, বস্তুত শক্তি বলে তা থেকে অভিন্ন, কিন্তু পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ সদ্বস্তু নয়, সুতরাং তাঁর স্বজাতীয় (চিজ্জাতীয়) ভেদও নেই। অনাদিকাল থেকে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপ, জীবান্তর্যামী পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকট করে বিরাজিত, তাঁরাও সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব; তাঁরাও পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নয় বলে তাঁরাও পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নন। পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিত্য পরিকরদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর অংশ, আবার কেউ কেউ বা তাঁর স্বরূপ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। সুতরাং, তাঁরাও পরব্রহ্মের সমজাতীয় ভেদ নন। এরূপে জানা গেল, পরব্রহ্ম হচ্ছেন বিজাতীয়-সজাতীয় ভেদহীন তত্ত্ব।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বগত ভেদও নেই। দেহ ও দেহী এ দুয়ের ভেদকেই সগত ভেদ বলে। জীবের দেহ হচ্ছে পঞ্চভূতাত্মক জড়বস্তু এবং দেহী বা জীবাত্মা হচ্ছে চিদ্‌বস্তু, পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তির অংশ। জড় ও চিৎ পরস্পর ভিন্ন বলে দেহ-দেহী ভেদ আছে। কিন্তু চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মে দেহ এবং দেহী– এরূপ দুটি বস্তু নেই, তাঁর দেহই তিনি এবং তিনিই দেহ; যেহেতু তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। *দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিৎ- কূর্মপুরাণ ৫/৩/৪২।* জীবে দেহ-দেহী ভেদ আছে বলে ও দেহের উপাদান পঞ্চভূত দেহের সর্বত্র সমপরিমাণে থাকে না বলে চোখ, কান প্রভৃতি এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে না, হাত-পা আদি অঙ্গ চোখ-কান প্রভৃতি অঙ্গের কাজ করতে পারে না। কিন্তু

পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন তত্ত্ব বলে তাঁর দেহের প্রতিটি উপাদান মাত্র একটি বস্তু– আনন্দ, চিদানন্দ বা চেতনাময় আনন্দ। সুতরাং, তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশে উপাদানের পরিমাণগত পার্থক্যের প্রশ্নও উঠতে পারে না। এজন্য তাঁর যেকোনো অঙ্গই যেকোনো ইন্দ্রিয়ের কাজ কাজ করতে পারে। *অঙ্গানি যস্য সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি- ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩২।* পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভেদহীন বস্তু।

উল্লিখিত আলোচনা হতে জানা গেলো– পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ-সজাতীয় ভেদহীন, স্বতঃসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদহীন ও স্বগতভেদহীন তত্ত্ব। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই হোক, কিংবা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেই হোক, পরব্রহ্ম হতে ভিন্ন বা দ্বিতীয় (অর্থাৎ ভেদ) কোথাও নেই বলে তিনি অদ্বিতীয়। *একমাত্র তিনিই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'*

চণ্ডীদেবী পরব্রহ্ম নন। মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, তিনি 'বিষ্ণুশক্তি', সর্বব্যাপক তত্ত্ব পরব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং, তিনি পরব্রহ্ম-নিরপেক্ষা নন, স্বতঃসিদ্ধাও নন। কেননা পরব্রহ্ম নন বলে তিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সমস্ত কিছু নন, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে মায়ারূপ চণ্ডীদেবীর গতি নেই। মার্কেণ্ডেয়পুরাণের উক্তির আলোচনায় পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে যে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি তাঁর 'দ্বিতীয়া' বা তাঁর থেকে ভিন্না নন, কেবল তা জানাবার জন্যই এই পয়ারে তাঁকে 'দ্বিতীয়া রহিতা' বলা হয়েছে।

জলরূপে তুমি সর্বজীবের জীবন।
তোমা স্মঙরিলে খণ্ডে 'অশেষ বন্ধন' ॥

হে দেবি, তুমি অদ্বিতীয়া চিৎ শক্তি হয়েও প্রকাশবিশেষ প্রাকৃত জগতের মাতা। জগতে জলরূপে তুমিই জগদ্বাসী সমস্ত জীবের জীবন সদৃশ। তোমার চিন্ময়ী শক্তি স্মরণ করলে জীবের জড়বন্ধন খণ্ডিত হয়। *আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥ (মা.পু. ৯১/৩)।*

সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মীমূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥

তিনি সাধুগণের গৃহে লক্ষ্মী ও পাপীগণের গৃহে কালরূপা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হয়েছে– *'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেস্বলক্ষ্মীঃ পাপাত্মানাং। কৃতধিয়াং হৃদয়েষুবুদ্ধিঃ॥* অর্থাৎ, যিনি স্বয়ং সাধুদিগের গৃহে লক্ষ্মী ও পাপীগণের (অসাধুগণের) গৃহে অলক্ষ্মী এবং যিনি সুবুদ্ধি জগজ্জনের হৃদয়ে বুদ্ধি।

তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টিস্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥

হে দেবি, তুমিই উল্লিখিত ত্রিগজতের, অর্থাৎ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও স্থিতি করে থাকো। যথা- *'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতং সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেহি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা। বিসৃষ্টি সৃষ্টিরূপা বা ত্বং স্থিতিরূপ পালনে॥ (মা. পু. ৮১/৫৬-৫৭)* অর্থাৎ- হে জগদ্রূপা, তুমি আদিতে সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা এবং অন্তকালে সংহাররূপা।

হে দেবী, তোমার চিন্ময়ী শক্তির অধীনে সেবাপরায়ণা না হলে জীব ত্রিবিধ দুর্গতি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ ভোগ করে।

তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া ॥

হে দেবী, তুমি সর্বদা বৈষ্ণবের উদয়া শ্রদ্ধা, অর্থাৎ তুমি সর্বত্র বৈষ্ণবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হও। হে মাতা, তোমার চরণের ছায়া দিয়ে আমাদের রক্ষা করো। *শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভস্য লজ্জা তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম (মা.পু. ৮৪/৪)*

তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর? ॥

মাতা, তোমার মায়ায় সমগ্র সংসার মোহিত হয়ে আছে। ভক্তিহীন জগৎ তোমার মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কষ্ট পায়। তুমি তাদের রক্ষা না করলে সেই অবোধ পুত্রেরা তোমাকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করতে পারে না, ফলে তারা মায়াপাশে আবদ্ধ হয়ে ভগবানে শরণাগত হতে পারে না।

সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা, কর নিজ দাস ॥

জগতের মুমুক্ষু লোকেরা তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা নির্যাতিত হয়ে বাসনানির্মুক্ত হতে চায়। সেসব সেবোন্মুখ জীবের হিতার্থে তুমি তাদের ত্রিবিধ দুঃখ অপসারিত কর এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখতার উপদেশ দাও।

ব্রহ্মাদি বন্দ্য তুমি সর্বভূত বুদ্ধি।
তোমা' স্মঙরিলে সর্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥

দেবতারা সবাই তোমারই পূজা করেন। গায়ত্রীদেবী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচার হতে মুক্ত করে সকলকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। তোমার স্মরণে সবরকমের মনোধর্ম দূরীভূত হয়ে চিত্তচাঞ্চল্য শোধিত হয়।

✱ প্রকৃত শক্তিপূজা

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, তত্ত্বত দুর্গাদেবী হলেন ভগবানের শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নেই। আলোকশক্তি ও দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নিকে, জ্যোৎস্নালোক যেরূপ চন্দ্রকে প্রকাশ করে, শক্তিও সেরূপ শক্তিমানকে প্রকাশ করেন। শক্তির কৃপা ব্যতীত কেউই শক্তিমানকে জানতে পারে না। আবার, শক্তিমানকে ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে শক্তির উপাসনা করেও শক্তির কৃপা পাওয়া যায় না, ঠিক যেমন সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যকিরণ পাওয়া যায় না। আভিধানিক অর্থে বস্তুর গুণ, স্বভাব বা প্রকৃতিকেই 'শক্তি' শব্দে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং, বস্তুতত্ত্ববিচারে শক্তি বস্তু নন, শক্তিমানই একমাত্র বস্তু, শক্তি বস্তুর গুণ মাত্র। "আমরা বস্তু স্বীকার করবো না, বস্তুর গুণমাত্র স্বীকার করবো; বস্তুর পূজা না করে বস্তুর গুণের পূজা করবো"– যারা এরকম ভাবেন, তাদের বিচার কখনোই পূর্ণ বলে প্রশংসনীয় হতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। শক্তিমান এক, শক্তি বহু; শক্তি শক্তিমানের অধীন, তাই কর্তৃত্ব একমাত্র শক্তিমানেরই; শক্তিমানের ইচ্ছায় শক্তি ক্রিয়াশীল হন, বস্তুর গুণ, শক্তি বা স্বভাবের কখনো স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে না। তদ্রূপ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছায় কিছু করতে পারেন না, যা ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা স্বয়ং বলেছেন– "সেই দুর্গা যাঁর ইচ্ছানুরূপ কার্য করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

ব্রজগোপিকাগণ শক্তিপূজার আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাঁরা শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করার জন্য যে যোগমায়া চিচ্ছক্তির উপাসনা করেছিলেন, তা-ই আদর্শ শক্তিপূজা। অর্থাৎ, ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বা তাঁর প্রতি ভক্তিলাভের জন্য যদি কেউ শক্তিপূজা করেন, তা-ই যথার্থ শক্তিপূজা।

জড়জগতে প্রকৃতির সত্ত্ব-রজ ও রজ-তমো গুণে আবদ্ধ জীবগণ স্ব-স্বভাবানুসারে যে বিভিন্ন দেবদেবীদের উপাসনা করেন, শক্তিপূজা তার মধ্যে অন্যতম। তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ নিজেদের শাক্ত অভিমান করে- মদ্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্যে দেবীর উপাসনা করেন। এভাবে তারা উত্তম শাক্ত হতে পারে না। তাই শাক্তদেরও তামসিক আচার পরিত্যাগ করে সাত্ত্বিকভাবেই পূজা করা উচিত।

উপাস্য তত্ত্ব বিচারে গৌতমীর তন্ত্রে বলা হয়েছে- *যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ* – অর্থাৎ ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলে, শক্তি-শক্তিমান অভেদ এই বিচারে কৃষ্ণ হতে অভিন্ন। সেই সাথে তার উপাসনা সম্পর্কেও বলা হয়েছে–

অর্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিং।

তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোহর্চ্চয়েৎ॥

অর্থাৎ, জগতে বন্দনীয় দেবদেব নারায়ণ শ্রীহরিকে পূজা করে তাঁর নির্মাল্য দ্বারা পীঠাবরণ দেবতাদের পূজা করতে হবে।

সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে

প্রাকৃতেহস্মিন লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণ

সেবার্থং চিচ্ছক্ত্যাত্মক দুর্গায়া

দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।

অর্থাৎ, জড় মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। এই জড়মায়া হচ্ছেন চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি দুর্গার দাসীরূপা। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবানের একটি মাত্র শক্তি। সেই একশক্তিই পরাশক্তি, চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি বলে অভিহিত হন। জড়াশক্তি সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা। জড়াশক্তিকে গীতায় অপরাশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়েছে।

বস্তুর সাথে বস্তু-ছায়াতে যেরূপ সম্পর্ক, চিচ্ছক্তির সাথে জড়া বা অপরাশক্তিরও সেরূপ সম্পর্ক। বস্তুর খোসা নিয়ে টানাটানি করলে ফল পাওয়া দুষ্কর।

জড়জগতে স্বরূপশক্তির পরিচয় সাধারণ লোকে জানে না। সকলে জড়া বা অপরা শক্তিকেই বহু সম্মানের সঙ্গে পূজা করে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে এই দেবীর মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পুরাণে দেবীকে জগৎকর্ত্রী বলা হয়েছে।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগত।

ত্বয়ৈত পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তেব সর্বদা॥

এছাড়া পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় ত্রিভুবন জয় করে দেবগণের শরণাপন্ন হলে দেবী অসুরদ্বয়কে বিনাশ করে দেবতাদের বিপদ দূর করেন। সাংখ্যগণ এ বিচারে জড়রূপিণী মায়াশক্তিকেই একমাত্র কর্ত্রী এবং চেতন পুরুষকে অকর্তা বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, চেতনাহীন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না। জড়ের প্রত্যেক কাজ চেতনের উপর নির্ভরশীল।

বেদে বলা হয়েছে যে, জড়রূপা প্রকৃতি কখনো জগৎকর্ত্রী হতে পারেন না; "স ঐক্ষত"– তিনি প্রকৃতিতে দৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করলে, লোহা যেরূপ আগুনের সংস্পর্শে দাহিকা শক্তি ধারণ করে, তেমনি প্রকৃতিও ভগবানের ঈক্ষণ প্রভাবে যাবতীয় কাজ করতে সমর্থ হন। ইতোমধ্যে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভগবান যে শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন, মার্কেণ্ডেয় পুরাণে

তাঁরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শক্তিমানের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়ে থাকে। চণ্ডীতেও দুর্গাদেবীকে বিষ্ণুমায়া বলা হয়েছে। যেহেতু, দেবী দুর্গা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীর প্রকাশ, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। তাইতো তাঁর মন্ত্রে নারায়ণী, বৈষ্ণবী শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। দুর্গাপূজার আবশ্যকীয় অঙ্গ হলো শালগ্রামশিলা বা নারায়ণশিলার অর্চনা। নারায়ণশিলা পূজা না করে ব্রাহ্মণগণ দুর্গাপূজা করেন না। কারণ, বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে বিষ্ণুমায়ার উপাসনা করা অবৈধ। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

যেহপন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম ॥৯/২৩॥

অর্থাৎ, "হে কৌন্তেয়, যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে তাদের পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে, তারা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।"

তার পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে বলছেন-

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরের চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যন্তি তে ॥৯/২৪॥

"আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।"

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥৯/২৫॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।"

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৯/২৬॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পন করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।"

দেবীদুর্গার আবির্ভাব প্রসঙ্গে চণ্ডীবর্ণিত ইতিহাস

পৃথিবীতে প্রথম কে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তা অনেকে জানতে চান। তাই এ প্রসঙ্গে কিছু পৌরাণিক কাহিনী নিম্নে আলোচনা করা হলো।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য কর্তৃক দুর্গাপূজা

সুশাসক ও বীর যোদ্ধা হিসেবে খ্যাত সুরথ ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট। স্বারোচিষ মন্বন্তরে (দ্বিতীয় মন্বন্তরে) চৈত্র বংশে তিনি রাজত্ব করেন। কিন্তু একসময় এক যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা তিনি পরাজিত হন। তখন তাঁর দুষ্ট, দুরাশয় ও বলবান আমাত্যগণ তাঁর ধনসম্পদ ও সেনাদের দখল করে নেয়। রাজত্ব হারিয়ে সুরথ মনের দুঃখে শিকারের ছলে বনে গমন করেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে একসময় তিনি মেধা নামে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপনীত হন। মেধাঋষি রাজাকে সমাদরপূর্বক তাঁর আশ্রয় দেন। কিন্তু বনে থেকেও তিনি মানসিকভাবে অশান্তিতে ভুগছিলেন। সবসময় তিনি তাঁর হারানো রাজ্যের কথা ভেবে শঙ্কিত হতেন। একদিন বনের মধ্যে সমাধি নামে এক বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে কথা বলে সুরথ জানতে পারলেন যে, সমাধির স্ত্রী ও পুত্ররা তাঁর সমস্ত অর্থ ও বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাঁকে বাড়ি থেকে বিতারিত করেছে। কিন্তু তথাপি তিনি সর্বক্ষণ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি উভয়েরই মনে প্রশ্ন জাগল– যারা তাঁদের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের প্রতি কেন তাঁরা এখনো আসক্ত হয়ে আছে? কেন তাঁরা ওদের কথা চিন্তা করে করে শঙ্কিত হচ্ছেন? উভয়ই মেধা ঋষির নিকট তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করে, এর কারণ জানতে চাইলেন। ঋষি বললেন, পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার প্রভাবেই তাদের এমন মনে হচ্ছে। ভগবানের এই মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী, তা এমনকি দেবতাদের মোহিত করে। তখন রাজা সুরথ মেধাঋষির নিকট মহামায়ার সম্পর্কে জানতে উৎসুক হলে, ঋষি দুর্গার আবির্ভাব ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে একে একে তিনটি কাহিনী বর্ণনা করেন। এই কাহিনীগুলোই শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচনার শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, মেধাঋষি কথিত দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে সুরথ ও সমাধি নদীতটে তিন বছর কঠিন তপস্যা ও মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন এবং দুর্গা তাঁদের দর্শন দান করেন। তাঁদের প্রার্থনানুসারে, দেবী দুর্গা সুরথকে তাঁর হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং সমাধি বৈশ্যকে ভবিষ্যতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কেবল বৈশ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করবেন, এরূপ বলেই শেষ করা হয়েছে; কিন্তু কী সেই ব্রহ্মজ্ঞান, দেবী তাঁকে কী জ্ঞান প্রদান করলেন এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা কীভাবে সমাধি বৈশ্যের মোক্ষ লাভ হলো, তার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। কিন্তু পঞ্চমবেদস্বরূপ অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ৬৩তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে- দেবী সুরথ রাজাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁকে মনুত্ব অর্থাৎ সমস্ত জগৎ শাসনের ভার দেয়া হবে বলে বর দিলেন। কিন্তু সমাধি বৈশ্য ছিলেন প্রকৃত বুদ্ধিমান। তিনি জানতেন যে, রাজত্ব ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী; তাই কী উপায়ে ভগবৎ কৃপা লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই পথ অনুসন্ধান করাই জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্তব্য। তাই তিনি ভগবতী দুর্গার কাছে তাঁর জড়বন্ধন মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় জানতে চাইলেন। তখন দেবী তাকে বললেন, আমার অভীষ্ট বর দিচ্ছি, যাতে তুমি দুর্লভ গোলোক ধামে গমন করবে-

সর্বসারঞ্চ যজ্জ্ঞানং সুরর্ষীণাং সুদুর্লভম্।
তদ্গৃহ্যতাং মহাভাগ গচ্ছ বৎস হরেঃ পদম্॥
স্মরনং বন্দনং ধ্যানমর্চনং গুণকীর্তনম্।
শ্রবণং ভাবনং সেবা সর্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্ ॥৬৩.১৮-১৯॥

"সর্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, দেবর্ষিদিগের অতি দুর্লভ; হে মহাভাগ, সেই জ্ঞান গ্রহণ করো। বৎস, বিষ্ণুপদে গমন করো। বিষ্ণুর স্মরণ, বন্দন, ধ্যান, অর্চনা, গুণকীর্তন, শবণ, ভাবনা, সেবা ও কৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ- এই নয় প্রকার বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ; এর দ্বারা জন্ম-মৃত্যু-বার্ধক্য-রোগ ও যমযাতনার নিবারণ হয়।"

দেবী আরো বলেন (৬৩.৩৩)- " যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, সেই বিরাটপুরুষ-পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ।"

"তুমি সেই সর্বসিদ্ধিদাতা পরাৎপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করো। ঈশ্বর ভিন্ন সকলেই নশ্বর জানবে। হে বৎস, পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, কল্যাণময়, শুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সুখে আরাধনা করো। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যপ্রদ 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করো (*কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং গৃহাণ কৃষ্ণদাস্যম্*) ও দুষ্কর পুষ্কর তীর্থে এই মন্ত্র দশলক্ষবার জপ করো; দশলক্ষবার জপেই তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হবে।"

দেবীভগবতী এরূপ বলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। এভাবে সমাধি বৈশ্যকে দেবী স্বয়ং কৃষ্ণমন্ত্র দান করে তাঁকে পুষ্কর তীর্থে সেই মন্ত্র জপ করে গোলোকপতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার উপদেশ দিলেন। পরবর্তীকালে দেবীর কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করে, কৃষ্ণের তপস্যা করে বৈশ্য গোলক ধাম অর্থাৎ,

কৃষ্ণলোকে গমন করে কৃষ্ণদাসত্ব প্রাপ্ত হন- ***বশ্যো নত্বা চ তাং ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং মুনে। পুষ্করে দুষ্করং তপ্ত্বা সম্প্রাপ কৃষ্ণমীশ্বরম্। ভগবত্যাঃ প্রসাদেন কৃষ্ণদাসো বভূব সঃ ॥ ব্র.বৈ.পু. প্রকৃতিখণ্ড ৬৩.৪৪ ॥***

সুতরাং, আমরা দেখছি দেবী দুর্গা যে ভক্তের উপর কপট কৃপা করেন, তাকে ধন, জন, রাজ্য আদি দিয়ে মায়ায় আসক্ত করেন, কিন্তু তিনি যে নিষ্কাম ভক্তের উপর নিষ্কপট কৃপা করেন, তাকে সমাধি বৈশ্যের মতো মায়ার আবরণ মুক্ত করে কৃষ্ণভক্তি দান করেন, তাই কৃষ্ণভক্তিই পরমঙ্গলকারক এবং জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মাধ্যমে দেবী দুর্গা এই শিক্ষাই আমাদের প্রদান করেন।

✵ মধু কৈটভ বধ

সৃষ্টিতে যখন প্রলয়, তখন সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বিশাল সমুদ্রে পরিণত হয়। সর্বত্র জল আর জল, অন্য কিছু থাকে না। সেসময় ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিজেকে যোগনিদ্রায় মগ্ন করে অনন্তশয্যায় শায়িত থাকেন। এভাবে একবার ভগবান বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর কর্ণমল থেকে মধু এবং কৈটভ নামক দুই ভয়ঙ্কর দৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল। তারা আবির্ভূত হয়ে কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তা দেখে ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুশক্তি ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে দেবী যোগনিদ্রা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় শরীর থেকে বহির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। তখন ভগবান গাত্রোত্থানপূর্বক জাগ্রত হয়ে মধু ও কৈটভ নামক ভয়ঙ্কর দুই দৈত্যকে দেখতে পেলেন। জগৎপ্রভু বিষ্ণু পাঁচ হাজার বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করেন। যদিও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বররূপে বিষ্ণু কেবল তাঁর ইচ্ছামাত্রই তাদের বধ করতে পারতেন; তথাপি লীলা বিস্তারের জন্য, বীররস আস্বাদনের জন্য এবং নিজের মায়াশক্তির মহিমা জগতে কীর্তিত করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর ভগবানের ইচ্ছায় মহামায়া দেবী তখন সেই অসুরদের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করলেন। বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হয়ে সেই মূর্খ অসুরদ্বয় ভগবান বিষ্ণুকে বললেন "আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন।" যিনি সকলের বরপ্রদাতা, স্বয়ং মায়াদেবীও যাঁর ইচ্ছায় জগৎ মোহিত করেন, তাঁকে কি না বর দিতে চায় সামান্য দুই অসুর। এটাই ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাব। তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন যে, "যদি তোমরা আমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তবে এখনই তোমরা আমার দ্বারা বধ্য হও। এটাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এখন অন্য বরের কী প্রয়োজন?" ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত অসুরদ্বয় মধু ও কৈটভ

তখন কমললোচন বিষ্ণুকে বলল, "আপনার যুদ্ধে আমরা সন্তুষ্ট। আপনার হাতেই আমাদের মৃত্যু হোক। তবে, সর্বত্র তো জলপ্লাবিত। যেখানে জল নেই, সেখানে আপনি আমাদের দু'জনকে বধ করুন।" তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণু "তা-ই হোক" বলে অসুরদ্বয়ের মস্তক তাঁর জঙ্ঘায় তথা উরুতে রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা ছেদন করলেন।

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা

বহুকাল আগের কথা। তখন অসুরদের রাজা মহিষাসুর এবং দেবরাজ ইন্দ্র। সেসময় শতবর্ষ ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে দেবগণকে পরাস্ত করে অসুরেরা স্বর্গরাজ্য দখল করল। তখন দেবগণ বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে শিব এবং বিষ্ণুর সমীপবর্তী হলেন এবং তাঁদের নিকট মহিষাসুরের দৌরাত্ম সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ভগবানের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ইচ্ছাময় হরি তাঁর শক্তির মহিমা প্রকাশ করলেন একটু ব্যতিক্রমভাবে। তিনি তাঁর মূর্তিমতি মায়াশক্তি দ্বারাই মহিষাসুরকে বধের ইচ্ছা করলেন। তখন বিষ্ণুর নির্দেশে দেবতাগণ তাঁদের সবার শক্তি একাত্রীভূত করলেন। প্রথমে শ্রীবিষ্ণু এবং তারপর শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে মহাতেজ নিঃসৃত হলো। এরপর অন্যান্য দেবতার শরীর থেকেও তেজ নির্গত হলো। ত্রিলোকব্যাপী সেই অনুপম তেজোরাশি একত্র হয়ে এক নারীমূর্তি প্রকট হলো।

ব্রহ্মার তেজে তাঁর পদযুগল, বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহুসমূহ এবং শিবের তেজে দেবীর মুখমণ্ডল সৃষ্টি হলো। ইন্দ্রের তেজে তাঁর শরীরের মধ্যভাগ, বরুণতেজে তাঁর জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়– এভাবে অন্যান্য সমস্ত দেবতার তেজে ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গারূপে প্রকাশিত হলো।

দেবতাগণ তাঁদের স্ব-স্ব অস্ত্র থেকে একটি করে অস্ত্র নির্মাণ করে দেবীকে অস্ত্র দান করলেন। শিব তাঁর ত্রিশূল থেকে একটা ভয়ঙ্কর ত্রিশূল নির্মাণ করে দেবীকে অর্পণ করলেন। ইন্দ্র তাঁর বজ্র থেকে আরেকটা বজ্র নির্মাণ করে দেবীকে অর্পণ করলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র থেকে আরেকটি সুদর্শন চক্র প্রকাশ করে দেবীকে অর্পণ করলেন। হিমালয়দেব বাহনস্বরূপ দেবীকে সিংহ এবং বিবিধ রত্ন প্রদান করলেন। সমস্ত দেবতা বিভিন্নরকম অলঙ্কার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করলেন। রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে দেবী বারংবার অট্টহাস্যসহিত ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করলেন। তখন মহিষাসুর অসংখ্য অসুরসহ সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হলো। এভাবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো।

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর, চামর নামক মহাসুর, উদগ্র, অসিলোমা, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ, দুর্মুখ, দুর্ধর প্রভৃতি বহু অসুরকে দেবী বধ করলেন। স্বীয় সমস্ত সৈন্য নিহত হলে মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণপূর্বক নিজেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। দেবীর অট্টহাস্যে ও ভৈরবনাদের সমস্ত জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। দেবী সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করে মহিষাসুরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক সংগ্রামের পর ক্রোধান্বিতা দেবী মহিষাসুরের কণ্ঠদেশ পদা দ্বারা নিপীড়ন করে ত্রিশূল দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। তখন মহিষাসুরও দেবীর পদাঘাতে নিজমুখ হতে অর্ধবহির্গত হয়ে স্তম্ভিত হলো। এরপর দেবী খড়্গাঘাতে মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন করে তাকে বধ করলেন। এই মহিষাসুর বধের নিমিত্তে ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবে সুরেশ্বর ভগবান তাঁর বহিরঙ্গাশক্তি দুর্গার দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের সুরক্ষা প্রদান করলেন।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরভ্রাতা স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিল। তখন দেবতাগণ হিমালয়ে গমন করে বিষ্ণুশক্তি দুর্গার স্তব করতে লাগলেন। এসময় সেখানে দেবী পার্বতী গঙ্গাস্নানের জন্য উপনীত হলেন। তখন অপর এক দেবী ইন্দ্রাদি দেবতাগণের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাঁর দেহকোষ থেকে উৎপন্ন হলেন। কৌশিকী নামে আখ্যাত সেই দেবীই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের চর চণ্ড ও মুণ্ড তাঁর মনোহর রূপ দেখে শুম্ভের নিকট গিয়ে বললেন, মহারাজ, পরমা সুন্দরী এক রমণী হিমালয় আলোকিত করে আছেন। এমন স্ত্রীরত্ন আপনারা কেন গ্রহণ করছেন না। চণ্ড-মুণ্ডের বাক্য শ্রবণ করে শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দূত হিসেবে নিযুক্ত করে দেবীর নিকট প্রেরণ করল। সুগ্রীব দেবীর নিকট শুম্ভ-নিশুম্ভের নির্দেশিত অসৎপ্রস্তাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করল। দেবী মনে মনে হাসতে লাগলেন, তথাপি গম্ভীরস্বরে বললেন, "তুমি যথার্থই বলেছ। শুম্ভ-নিশুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি ও মহাবীর। তবে, আমি পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে আমাকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে, কেবল তিনিই আমার পতি হবেন। এখন আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি কীভাবে! তাই তুমি মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বলো, তাঁরা যেন এখানে এসে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করেন।" দেবীর বাক্য শুনে সুগ্রীব ক্রোধিত হয়ে দেবীকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিল। কিন্তু দেবী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে তাকে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে প্রেরণ করলেন।

সুগ্রীবের মুখে দেবীর কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে অসুররাজ শুম্ভ দৈত্যসেনাপতি

ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করলেন। ধূম্রলোচনের সঙ্গে দেবীর তুমুল যুদ্ধ হলো এবং সেই যুদ্ধে ধূম্রলোচন পরাজিত ও নিহত হলো। এমন দুঃসংবাদ পেয়ে শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ড ও অন্যান্য অসুরসেনাদের যুদ্ধে প্রেরণ করলো। দেবী অম্বিকা তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তখন তাঁর ললাটদেশ থেকে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা দেবী কালী প্রকটিত হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। সেই তুমুল যুদ্ধে দেবী চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে চামুণ্ডা নামে খ্যাত হলেন।

চণ্ড-মুণ্ড বধের বার্তা পেয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ আরো দৈত্যসেনা সুসজ্জিত করে দেবীর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করলেন। তখন অসুরবিনাশ ও দেবদিগের বিজয়ে জন্য পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন দেবশক্তি মূর্তিমতি দেবীরূপে প্রকাশিত হয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন– ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী প্রমুখ। তাঁরা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে একে একে সমস্ত দৈত্যসেনাকে বধ করতে লাগলেন। তখন রক্তবীজ দৈত্য সেখানে উপস্থিত হলো, যার এক রক্তবিন্দু ভূপতিত হওয়া মাত্রই তা থেকে পুনরায় রক্তবীজ দৈত্য সৃষ্টি হয়। দেবী দুর্গা কালীর সহায্যে সেই রক্তবীজ অসুরকে বধ করলেন।

এরপর শুম্ভ তার ভ্রাতা নিশুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর দেবী দুর্গা নিশুম্ভকেও বধ করলেন। প্রাণতুল্য ভ্রাতার প্রাণসংহার দেখে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীকে বলল, "হে বলগর্বে উদ্যতা দুর্গা, তুমি গর্ব করো না, কারণ তুমি অন্যান্য দেবীর সহযোগিতা নিয়ে যুদ্ধ করছো।" তখন দেবী বললেন– "একা আমিই এ জগতে বিরাজিত। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই বিভূতি। দ্যাখ্, এরা আমার দেহে বিলীন হচ্ছে।"

তখন অন্যান্য সমস্ত দেবী দুর্গার দেহে বিলীনা হলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভের সকল লোকের ভীতিপ্রদ তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। অবশেষে দেবী শুম্ভকে বক্ষস্থলে শূলবিদ্ধ করে ভূপতিত ও বধ করলেন। দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন।

এভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিবিধ শক্তি দ্বারা বারংবার দেবতাদের রক্ষা করে জগৎ পালন করেন।

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বাংলাদেশে প্রচার করেন। তিনি মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র। রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট আকবরের বাংলাদেশের সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন। তার ফলে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও রাজ উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করে বরেন্দ্র সমাজের ব্রাহ্মণদের নেতা হয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। এজন্য তিনি বাংলাদেশের একজন বিশেষ সমাজপতি বলে পরিগণিত। একদিন তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আহ্বান করে একটা মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতেরা সমবেত হয়ে নানারকম বিচার করতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্যরা বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত গোষ্ঠীর শ্রীরমেশ শাস্ত্রী তখনকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ– এই চারটি যজ্ঞ, যেগুলো মহাযজ্ঞ নামে কথিত। কিন্তু 'বিশ্বজিৎ' ও 'রাজসূয়' কেবল সার্বভৌম রাজারাই করতে পারেন এবং 'অশ্বমেধ' ও 'গোমেধ' যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ, আর তাছাড়া এই চারটি যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের জন্য বিধেয়, ব্রাহ্মণদের এই যজ্ঞগুলো করা উচিত নয়। পূর্বকালে রাজা সুরথ আদ্যাশক্তির অর্চনা করে চতুর্বর্গ ফল লাভ করেন, সুতরাং রাজামহাশয়ের এই শরৎকালেই দুর্গাপূজার অনষ্ঠান করা কর্তব্য। তাহলেই তিনি স্বর্গাদির ফল লাভ করতে পারবেন। সমাগত পণ্ডিতেরা তাঁর এই মতে সম্মতি প্রদান করলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট-লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশে অকালে দূর্গোৎসব করেছিলেন। আধুনিক দূর্গোৎসব বা শরৎকালীন অকালবোধন সেই রমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্তিত। এছাড়াও ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার, ১৭১১ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও ১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভের সম্মানে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা নবকৃষ্ণ দেব কর্তৃক শারদীয় দুর্গাপূজার বর্ণনা শোনা যায়।

পর্ব–৩ দুর্গাপূজা ও কিছু অজানা কথা

দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক: সম্মিলিত পূজার গূঢ়তত্ত্ব

আমরা বাঙালিরা মা দুর্গাকে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত তা হলো দশভুজা, মহিষাসুর বধে উদ্যতা, সিংহবাহিনী, বামে লক্ষ্মী ও গণেশ এবং ডানে সরস্বতী ও কার্তিক। আমরা দেবীকে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে পূজা করি। উত্তর ভারতে দেবী দুর্গা অবশ্য এই যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে পূজিত হন না। সেখানে দেবী অষ্টভুজা, অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিতা হয়েও শান্তভাবে প্রসন্নবদনে সিংহ বা বাঘের পিঠে বসে আছেন এবং এক হাত আশীর্বাদ মুদ্রায় রেখেছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে। আবার, দক্ষিণভারতে সাধারণত চর্তুভুজা, পদ্মাসনে উপবিষ্টা রূপে তিনি পূজিত হন। তবে রূপ যা-ই হোক না কেন, তিনি সর্বরূপেই ভক্তদের কল্যাণকারিণী।

লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে যে, দেবীদুর্গার বামে যে ধনদাত্রী লক্ষ্মী এবং ডানে জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী দণ্ডায়মাণ, তারা মা দুর্গার দুই কন্যা। কিন্তু বৈদিকশাস্ত্র অনুসারে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আদি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সৃষ্টি-পালন-সংহারকার্যে আদি শক্তি তিনরূপ হয়েছিলেন– *ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতং সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেহি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা। বিসৃষ্টি সৃষ্টিরূপা বা ত্বং স্থিতিরূপ পালনে॥ (মা. পু. ৮১/৫৬-৫৭)*। সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মার জ্ঞানশক্তিরূপে মহাসরস্বতী, পালনকার্যে বিষ্ণুর পালনকারিণী শক্তিরূপে মহালক্ষ্মী এবং সংহারকার্যে শিবের প্রলয়কারিণী শক্তিরূপে মহাকালী, যিনি দুর্গা থেকে অভিন্ন।

আবার, ভগবানের চিৎ-শক্তির ছায়াস্বরূপা এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ত্রিগুণময়ী। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত প্রাধানিক রহস্যে মেধস ঋষি বলছেন, সেই ত্রিগুণময়ী দেবীর তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক এই ত্রিবিধা মূর্তি–*ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকই যা ত্রিধাদিতা*। সত্ত্বগুণে সরস্বতী, রজোগুণে লক্ষ্মী এবং তমোগুণে দেবীকালী।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু ভগবানের চিচ্ছক্তি নির্গুণা অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, সুতরাং, ত্রিগুণময়ীরূপে দেবী দুর্গার সঙ্গে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজিতা হন, তাঁরা অবশ্যই নির্গুণা বা গুণাতীতা চিচ্ছক্তি নন। অতএব, ত্রিগুণময়ীরূপে পূজিতা এই দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হলেন ভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা এবং জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী।

অর্থাৎ, দেবী দুর্গা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীর প্রকাশ। তাইতো তার মন্ত্রে নারায়ণী, বৈষ্ণবী শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। দুর্গাপূজার আবশ্যকীয় অঙ্গ হলো শালগ্রামশিলা বা নারায়ণশিলার অর্চনা। নারায়ণশিলা পূজা না করে ব্রাহ্মণগণ দুর্গাপূজা করেন না।

মায়ের বামে সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহর্তা গণেশ এবং ডানে শৌর্য বীর্যের প্রতীক দেবসেনাপতি কার্তিক। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এই চারজন দেবতা যেন সমাজের চারবর্ণের প্রতীক। সমাজের চারবর্ণ হলো বুদ্ধিজীবি- ব্রাহ্মণ, শাসকশ্রেণি-ক্ষত্রিয়, বৃত্তিজীবি-বৈশ্য এবং শ্রমজীবি- শূদ্র। সরস্বতী বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী ও সত্ত্বগুণস্বরূপিণী। তাই তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতীক। বীরত্ব ও তেজের প্রতীক কার্তিকেয় ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন। দেবী লক্ষ্মী অন্ন, শস্য, সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী যা বৈশ্যদের দ্বারা সম্পাদিত কৃষিকাজ ও ব্যবসার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। আর গণপতি গণেশ যেন গণদেবতারূপে শ্রমিকশ্রেণিকে বা শূদ্রদের কর্মদক্ষতা প্রদান করছেন। চারটি বর্ণেরই গুরুত্ব আছে। শরীরে মাথার যেমন প্রয়োজন তেমনি পায়েরও প্রয়োজন। সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকমতো কাজ করলে তবেই শরীর সুস্থ থাকবে। বেদে দেবী দুর্গা বলেছেন– 'অহং রাষ্ট্রী'– তেমনি এই চারবর্ণ সঠিকভাবে কাজ করলেই রাষ্ট্র উন্নত হয়।

দেবীর পদতলে মহিষাসুর শূলবিদ্ধ অবস্থায় আছে। দেবীর বাহন সিংহ অসুরকে চেপে ধরে আছে। পশুরাজ সিংহটি আমাদের মনের প্রতীক। যদি আমরা আমাদের পশুরাজ সিংহরূপী মনের উপর ধর্মরূপী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে তিনি আমাদের মনের অসুররূপী আসুরিক প্রবৃত্তিগুলোকে শূলাঘাতে বিনষ্ট করবেন।

✲ দুর্গাদেবী প্রসঙ্গে বেদে কী বলা হয়েছে?

বর্তমানযুগে একদল অতিপণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছে, যারা বেদকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে সকল প্রকার ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান হিন্দুসমাজে বেদ তো দূরের ব্যাপার, গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থও অধিকাংশ লোক জানার চেষ্টা করে না; ফলে তাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করে নিজ মতে দীক্ষিত করা খুব সহজ। এই শ্রেণির লোকেরা বেদকে কেন্দ্র করে নানারকম অপপ্রচার, অর্ধসত্য, অর্ধশ্লোক ও বিকৃত অর্থ করার মাধ্যমে বেদে মূর্তিপূজা নিষেধ, ঈশ্বর সাকার নন বা দুর্গা দেবীর অস্তিত্ব বেদে নেই, এমন কিছু উদ্ভট সিদ্ধান্ত প্রচার করে থাকেন। এখন আমরা দেখবো বেদে কি আসলেই দুর্গা নেই এবং দুর্গাপূজার মতো মহাপূজা হঠাৎ করেই মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে–

তাং অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম, দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক-১০/২)

অর্থাৎ, অগ্নিবর্ণা তপ প্রদীপ্তা সূর্য (বা অগ্নিস্বরূপিণী) যিনি কর্মফলের প্রার্থিত হন, সেই দুর্গাদেবীর আমি শরণাপন্ন হই, হে সুন্দররূপে, ত্রাণকারিণী, তোমাকে নমস্কার। ঋগ্বেদে দেবীসুক্ত যা দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করার বিধি আছে, সেখানে

দেবীকে পরমা প্রকৃতি, নির্বিকারা ও জগতের ধাত্রীরূপে বর্ণিত আছে। সমস্ত দেবতার তেজ হতে দেবীদুর্গার আবির্ভাবের পর দেবী দুর্গা দেবতাদের ঋকমন্ত্রে নিজের পরিচয় দিলেন বলে দেবী পুরাণে উল্লেখিত আছে; আর সেই ঋক্মন্ত্রই হলো ঋগ্বেদের দেবীসুক্ত। এছাড়া বেদের রাত্রিসুক্তে কালী, শ্রীসুক্তে লক্ষ্মী এবং বাণীসুক্তে সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বেদ দেবতাদের মহিমা এবং তাদের শক্তি বর্ণনার উপর গুরুত্ব দিয়েছে, আর পুরাণে তাদের বিস্তারিত রূপ ও পূজাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর বেদকে স্বীকার করলে পুরাণকেও স্বীকার করতে হবে। কারণ, বেদ এবং বেদান্ত নিজেই পুরাণকে স্বীকার করেছে। যেমন– ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে- *'ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমো বেদানাং...' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭/১/২, ৩ ও ৭/২/১)* অর্থাৎ, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ হলো পঞ্চম বেদ। আবার, অথর্ববেদ বলছে *'ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ .... চ'*। যেহেতু বেদ পুরাণকে শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছে, তাই পুরাণ মতেই দেবী দুর্গার রূপ ও পূজাপদ্ধতি প্রণীত হয়েছে। যাহোক, আবারো আমরা বৈদিক ধারায় ফিরে আসি। শুক্ল যর্জুবেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবীর সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালীর, কেন উপনিষদে দেবী উমার কথা পাই যারা দেবী দুর্গারই অপর নাম।

যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রী আছে– *'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।'*

এখানে দুর্গা সম্বোধনপদে দুর্গি হয়েছে। এতে কাত্যায়নী বা কন্যাকুমারী দুর্গার অপর নাম তা সকলেই জানে। এছাড়া গোপাল তাপনী উপনিষদ, নারায়ণ উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থে দুর্গার উল্লেখ আছে।

✲ দুর্গাপূজায় নয় প্রকার দ্বারের মাটির ব্যবহার প্রসঙ্গ

দুর্গাপূজায় দেবীর প্রতিমা গড়তে নয় প্রকার স্ত্রীলোকের গৃহদ্বারের মাটি লাগে বলে একটি প্রথা সমাজে প্রচালিত আছে– ব্রাহ্মণী, মালিনী, গোয়ালিনী, ধোপানী, শূদ্রানী, নাপিতানী, কাপালিক (তান্ত্রিক মহিলা), নর্তকী এবং পতিতা। দুর্গাপূজায় এই নয় প্রকার স্ত্রীলোকের গৃহদ্বারের মৃত্তিকার ব্যবহার একান্তই তন্ত্র মত। মূল দেবীপুরাণে এ ধরনের কথা বলা হয়নি। বাংলার বাইরে দুর্গামূর্তি গড়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়ম সর্বত্র বিদ্যমান নেই।

যাহোক, এই প্রথা অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা সতীসাধ্বী ব্রাহ্মণী থেকে শুরু করে পতিতা পর্যন্ত সকল স্তরের নারীদের মাতৃজ্ঞানে সমমর্যাদা দান করা হয়েছে এই দুর্গাপূজায়। কারণ, সকল নারীকেই ভগবতী মাতার অংশ বলে সম্মান করা উচিত, তা সে ব্রাহ্মণ পত্নী হোক বা পতিতাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১১.৬) বলা হয়েছে– *তব দেবি ভেদা স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।* অর্থাৎ, পাতিব্রত্য,

সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সমস্ত নারীই মা দুর্গার অংশসম্ভূতা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও প্রকৃতিখণ্ডে (১.১৩৯) বলা হয়েছে–

কলাংশাংশসম্ভুতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥

"এজগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হতে উৎপন্না। অতএব, স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতি তথা দুর্গাই অপমানিতা হন।"

আমরা দেখি, প্রখ্যাত মাতৃসাধকগণ, যারা দেবীর আরাধনা করে সিদ্ধি লাভ করছেন, তাঁদের নৈতিক চরিত্র কতটা উন্নত ছিল। তাঁরা সর্বস্তরের নারীকেই দেবীর অংশজ্ঞানে মাতৃরূপে সম্মান করতেন।

তাই, যে উৎস থেকেই শুরু হোক, আমরা এই রীতিকে ইতিবাচকভাবেও চিন্তা করতে পারি। বৈদিক শাস্ত্রে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ সম্মান করার কথা বলা হয়েছে –*মাতৃবৎ পরদ্বারেষু*। পরস্ত্রীকে যদি সকলেই ওইরূপ দেবীর অংশস্বরূপ মাতৃজ্ঞানে সম্মান করেন, তখন না কোনো পুরুষ পতিতালয়ে যাবে, আর না কোনো পতিতা থাকবে সমাজে। তখন পুরুষের মধ্যে পতিত হওয়ার প্রবৃত্তি থাকবে না এবং পতিতাদের এই বৃত্তিও থাকবে না এবং সমাজ হবে কলুষমুক্ত।

❁ নবপত্রিকা বা কলাবৌ প্রকৃতপক্ষে কী?

নবপত্রিকা তথা প্রচলিত ভাষায় কলাবৌ নিয়ে আমাদের অনেকেরই কৌতুহল ছোট বেলা থেকেই। গণেশের পাশে একটি কলাগাছকে শাড়ি, মালা, সিঁদুর পড়িয়ে পূজা করার দৃশ্য বাঙ্গালি হিন্দু মাত্রেরই পরিচিত। আসলে দুর্গাদেবী প্রকৃতিস্বরূপা, তিনিই মাতার ন্যায় প্রকৃতিকে পালন করেন। দেবী দুর্গার এই কৃষি, অন্নদাত্রী বা প্রকৃতিস্বরূপা রূপই হলো নবপত্রিকা। এতে নয় রকম গাছের শাখা একত্রে শ্বেত অপরাজিতা ফুল গাছের লতা দ্বারা বেঁধে পূজা করা হয়। 'নব' অর্থ নয়, আর 'পত্রিকা' অর্থ পাতা। এই নয় প্রকার বৃক্ষ আদিশক্তির নয়জন রূপকে প্রতীকায়িত করে। নয় প্রকার বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী ৯ জন দেবী রয়েছেন–

কলাগাছ, কালোকচু গাছ, হলুদ গাছ, মানকচু গাছ, ধানগাছ, বেল গাছ, জয়ন্তী গাছ, অশোক গাছ ও ডালিম গাছ– এই নয়টি গাছ যথাক্রমে ব্রহ্মাণীদেবী, দেবী কালী, দেবী দুর্গা, দেবী চামুণ্ডা, দেবী লক্ষ্মী, দেবী শিবানী, দেবী জয়ন্তী, শোকরহিতা ও রক্তদন্তিকা– দেবী দুর্গার এ নয় রূপের প্রতিনিধিত্ব করে।

যেদিন দুর্গামূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় অর্থাৎ, মূল পূজা শুরু হয়, সেই সপ্তমীর সকালে কলাবউ বা নবপত্রিকা স্নান করিয়ে তাকে নতুন শাড়ি পড়িয়ে মণ্ডপে গণেশের পাশে রেখে পূজা করে তারপর মূল দুর্গাপূজা শুরু হয়। অর্থাৎ, নবপত্রিকা স্বয়ং দেবী দুর্গারই প্রকৃতিস্বরূপিণী রূপ।

❁ মহালয়া কী?

মহালয়া বা পিতৃপক্ষের দিন দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু। এই দিন পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের শুরু। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে গণেশ উৎসব পরবর্তী পূর্ণিমা (ভাদ্রপূর্ণিমা) তিথিতে এই পক্ষ সূচিত হয় এবং সমাপ্ত হয় সর্বপিতৃ অমাবস্যা বা মহালয়ার অমাবস্যা তিথিতে। বাঙ্গালি সমাজে পিতৃপক্ষের শেষদিন অর্থাৎ অমাবস্যা তিথির মহালয়ার দিন পিতৃতর্পণ করার রীতি আছে। সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করলে পিতৃপক্ষ সূচিত হয়। এ সময় পিতৃপুরুষগণ সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাদের উত্তরপুরুষদের হাতে জল, পিণ্ড আদি পাওয়ার জন্য। মহাভারত অনুযায়ী, প্রসিদ্ধ দাতা কর্ণের মৃত্যু হলে তার আত্মা স্বর্গে গমন করলে স্বর্গে তাকে স্বর্ণ ও রত্ন খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ইন্দ্র বলেন, তিনি সারাজীবন স্বর্ণই দান করেছেন, কিন্তু পিতৃপুরুষকে খাদ্য দেননি। তাই স্বর্গে স্বর্ণই তাকে খাদ্য হিসেবে দান করা হয়েছে। এ কারণে কর্ণকে ষোল দিনের জন্য মর্ত্যে গিয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পক্ষই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। মহালয়ার দিনই পিতৃপক্ষের শেষ দিন। তাই এদিন খুব ভোরে পুরুষেরা গঙ্গা বা কোনো নদীর তীরে গিয়ে জলে নেমে কোশাকুশি, তিল, জল আদি বস্তু নিয়ে ব্রাহ্মণের সহায়তায় পিতৃপুরুষকে তর্পণ করেন। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যারা অপারগ, তারা এই সর্বপিতৃ অমাবস্যা বা মহালয়ায় তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দান আদি করতে পারেন পিতৃপুরুষের আত্মার উন্নতির জন্য। কর্মকাণ্ডীয়দের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন গয়ায় শ্রাদ্ধ করলে বিশেষ ফল লাভ হয়। উল্লেখ্য, শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-চিহ্নধন্য গয়াধামে সমগ্র পিতৃপক্ষ জুড়ে মেলা চলে। এই দিন অতি প্রত্যুষে চণ্ডীপাঠ করার রীতি আছে।

❁ দুর্গাপূজার বিভিন্ন তিথির আনুষ্ঠানিকতা

বাঙ্গালিদের প্রচলিত রীতিতে মহালয়া বা প্রতিপদে দেবীর মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করা হয় বিল্ববৃক্ষতলে (বেল গাছ তলা)। ষষ্ঠী তিথি পর্যন্ত বেলতলায় পূজা চলে কেবল ঘটের মাধ্যমে। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। বোধন অর্থ জাগরণ। অনেকে শরৎকালের এই বোধনকে অকালবোধনও বলে থাকেন। এর কারণ হলো দেবীকে অকালে জাগানো হচ্ছে। বর্ষাকালীন শয়ন একাদশীতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু যোগনিদ্রায় যান। এ সময় স্বর্গলোকে রাত্রি শুরু হয় ৬ মাসের জন্য। তাই দেবতারা এ সময় ঘুমন্ত। এজন্য শরতে দেবীপূজার আগে অকালে তাকে জাগিয়ে নেওয়াকেই অকালবোধন বলে। এ সময় সূর্যের দক্ষিণায়ন চলে। অবশ্য অনেক জায়গায় বিশেষ করে অস্থায়ী মণ্ডপগুলোতে ষষ্ঠীর দিনই বেল গাছের ডাল পুঁতে ঘট স্থাপন করা হয়।

সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা বা কলাবৌ স্নান করিয়ে মণ্ডপে তোলা হয় এবং গণেশের মূর্তির পাশে বসিয়ে পূজা করার মাধ্যমে মূল দুর্গাপূজা শুরু হয়। সপ্তমীর দিন দেবীর মঙ্গলঘট বেলতলা থেকে মূল পূজামণ্ডপে আনা হয়। এদিনই দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে দেবীকে প্রতিমায় পূজা শুরু হয়। এরপর অষ্টমীর দিন দেবীর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দেয়া হয়। চালকুমড়ো বা আখ বলিদান হয়। আবার, তামসিক রীতিতে অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা পশুবলিও করে থাকে। এদিন আরেকটি বিশেষ পূজা হয়, তা হলো সন্ধিপূজা। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির শুরুর ২৪ মিনিটের মধ্যে সন্ধিপূজা শেষ করতে হয়। এই পূজায় মূলত দেবীকে কালীরূপে পূজা করা হয়। দেবীর চরণে ১০৮টি পদ্মফুল এবং ১০৮টি প্রদীপ নিবেদনের রীতি আছে। দুর্গাপূজার সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ তিথি এই মহা অষ্টমী। নবমীর দিন দেবীর বিহিত পূজা, যজ্ঞ, চণ্ডী পাঠ ইত্যাদি হয়। বিজয়াদশমীর দিন সকালে দশমীবিহিত পূজা হয়। এই দিন একবারই পূজা ও অনুকল্প ভোগ দেওয়া হয় এবং কোনো অন্নভোগ দেওয়া হয় না, কারণ মা সকালেই পূজা শেষে চলে যাচ্ছেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, ঘট ও প্রতিমা নাড়া দিয়ে, ঘটের চারপাশে সুতার বন্ধনী কেটে দেবীকে মুক্ত করেন। জলে রাখা দর্পণে দেবীর মুখ ভেসে ওঠে। এভাবে দেবীর প্রতিকী বিসর্জন হয়ে যায়। তারপর কিছু স্ত্রী-আচার ও লোকাচার আছে। যেমন, সিঁদুর খেলা, দেবীকে বরণ করা, দেবী প্রতিমার মুখে মিষ্টি দেওয়া, কানে কানে 'আসছে বছর আবার এসো' বলা ইত্যাদি। সর্বদা রমণীরা নিজে সিঁথির সিঁদুর দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

✵ দেবী দুর্গার আরাধনা-কাল ও নবরাত্রি

দেবী দুর্গার আরাধনার চারটি কাল রয়েছে বছরে, যদিও আপামর বাঙ্গালি দুর্গাপূজা বলতে শারদীয় পূজাকেই বোঝে, কেউ কেউ আবার এছাড়া বাসন্তী দুর্গাপূজার কথাও জানেন। কিন্তু দেবী আরাধনার চারটি বিশেষ সময় আসে বছরে। মহালয়ার অমাবস্যা তিথির পরের দিন প্রতিপদ থেকে শুরু করে নবমী পর্যন্ত নয়দিন সময়কে বলা হয় নবরাত্রি। বাংলা, আসাম বাদে সারা ভারত এবং নেপালে দুর্গাপূজা নয়দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। সেসব জায়গায় দুর্গাপূজা নবরাত্রি উৎসব নামে পরিচিত। বছরে ৪টি নবরাত্রি আসে, তারা হলো- আশ্বিনী নবরাত্রি (বাঙ্গালির দুর্গাপূজা), চৈত্র নবরাত্রি (বাসন্তী পূজা), আষাঢ়ী নবরাত্রি (এটি গুপ্ত নবরাত্রি নামে পরিচিত, এই ব্রতপালন গুপ্তভাবে করতে হয়) এবং মাঘী নবরাত্রি (এটি কেবল সাধকদের জন্য, গৃহস্থ বা সাধারণ লোকের জন্য নয়)। এই নয় সংখ্যাটিতে একটি তাৎপর্য আছে। এই নয়দিনের অধিষ্ঠাত্রী নয়জন দেবী আছেন, যারা দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপ এবং এরা নবদুর্গা নামে পরিচিত।

✵ নবদুর্গা ও আদর্শ পূজাবিধি

নবদুর্গা পূজায় নয়জন দেবী হলেন–
প্রতিপদে– গিরিরাজ হিমালয়কন্যা শৈলপুত্রী
দ্বিতীয়াতে– তপশ্চর্যাকারিণী দেবী ব্রহ্মচারিণী
তৃতীয়াতে– শান্তি ও কল্যাণের দেবী চন্দ্রঘণ্টা
চর্তুথীতে– ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন কারিণী দেবী কুষ্মাণ্ডা
পঞ্চমীতে– কুমার কার্তিকেয় (স্কন্দ) এর মাতারূপী দেবী স্কন্দমাতা
ষষ্ঠীতে–ঋষি কাত্যায়নের কন্যা, ব্রজগোপীদের পূজিতা দেবী কাত্যায়নী
সপ্তমীতে– দুষ্টের দমনকারী অতি উগ্ররূপা দেবী কালরাত্রি
অষ্টমীতে– মহাদেবপত্নী দেবী মহাগৌরী
নবমীতে– সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী দেবী সিদ্ধিদাত্রী

এই নয়দিনে একেক দেবীর পূজা হয়। বাঙ্গালিদের কাছে দুর্গাপূজা এক লাগামহীন আনন্দ ফুর্তির উৎসব হলেও ভারতের অন্যান্য জায়গায় নবরাত্রি এক কঠোর সংযমের ব্রত। এ নয়দিন তারা অন্ন তথা যেকোনো প্রকার শস্য অর্থাৎ ভাত, ডাল, রুটি, সুজি ইত্যাদি খাওয়া ত্যাগ করেন। অনেকে সারাদিন উপবাস করে রাতে অনুকল্প প্রসাদ তথা ফল, দুধ, সাবু, সবজি ইত্যাদি গ্রহণ করেন। অসমর্থ ব্যক্তিরা দিনেও অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, এই ব্রত একাদশী ব্রতের ন্যায় পালন করতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে আমাদের মধ্যে মাসে মাত্র দু'টি একাদশী করতে বেশিরভাগ লোক ভীত হয়, অথচ তারা টানা ৯ (নয়) দিন একাদশীর মতো ব্রত করে। বাড়িতে বাড়িতে মহালয়ার পরদিন মাটির পাত্রের উপর মাটি বিছিয়ে তাতে শস্যের দানা ছড়িয়ে এর উপর দেবী দুর্গার মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করে নয়দিন পূজা করেন। এই নয়দিন ঘটের নিচের মাটিতে জল দেয়া হয়, যার ফলে শস্যের দানা অঙ্কুরিত হয়ে ঘটের চারপাশে ঘাসের মতো আচ্ছাদন তৈরি করে। দেবীর বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, অষ্টমীতে বাড়িতে ব্রাহ্মণ ডেকে চণ্ডীযজ্ঞ এবং নবমীতে নয়জন কুমারী বালিকাকে দেবীস্বরূপে পূজা করে তাদের বস্ত্র, শৃঙ্গারদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, **পূর্ণ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়সংযম ও ভক্তি দ্বারা দেবীর প্রসন্নতার জন্য তারা এইরূপে পূজা করে মায়ের যথার্থ কৃপা লাভ করেন।**

অথচ আমরা যেন দুর্গাপূজা এলেই মেতে উঠি এক লাগামহীন ইন্দ্রিয়তর্পণে। কোনোরকমে সকালবেলা না খেয়ে কিছু মন্ত্র পড়ে ফুল বেলপাতা দেবীর পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ বেরিয়ে পড়ে মাছ, মাংস, রসুন, পেঁয়াজ জাতীয় তামসিক আহার গ্রহণের প্রতিযোগিতায়। নতুন কাপড়, সাজগোজ, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা, ফটো তোলা ইত্যাদি চলতে থাকে। আর রাতের বেলা মদ খেয়ে মায়ের সামনে

উন্মাদ নৃত্য। অথচ এই পর্বটি জগজ্জননীকে প্রসন্ন করার জন্য তপস্যা করার উৎকৃষ্ট তিথি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এসকল বিধি অনুশীলন না করে আসুরিক প্রবৃত্তিবশত অনাচারে লিপ্ত হয়। মায়ের এই রূপ অসুরনিধনেরই জন্য। **তাই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনকারী এরূপ অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অবশ্যই মায়ের রোষানলে দগ্ধ হবে।**

✵ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধন কি মূল রামায়ণে আছে?

শরৎকালের দুর্গাপূজা অকালপূজা বা অকালবোধন বলে খ্যাত। কারণ, দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্র মাস। দেবীর সে সময়কার পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কল্পনাপ্রবণ কিছু লোক প্রচার করে যে, শরৎকাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ইতিহাস শ্রীরামচরিত্রের পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণে নেই। কিংবা রামায়ণের অন্যান্য সংস্করণ যেমন তুলসীদাসের রামচরিতমানস, দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় কাম্ব রামায়ণ, কন্নড় ভাষায় কুমুদেন্দু রামায়ণ, অসমিয়া ভাষায় কথা রামায়ণ, ওড়িয়া ভাষায় জগমোহন রামায়ণ, মারাঠি ভাষায় ভাবার্থ রামায়ণ, উর্দু ভাষায় পুথি রামায়ণ প্রভৃতি কোথাও নেই। অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত দেবীভাগবত ও শাক্ত কীর্ত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত প্রচলিত রামায়ণের ইতিহাস কেবল বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই প্রচলিত। তবে, আধুনিককালে এ পূজা এখন বিশ্বের বাঙালি অধ্যুষিত অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

✵ দেবীভাগবত কি প্রামাণিক গ্রন্থ?

কতিপয় অপসিদ্ধান্তপর স্মার্তদের মতে শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্বে দেবী ভাগবত রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবী ভাগবত আধুনিক পুঁথি। শ্রীমদ্ভাগবতের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই অবৈধ অনুকরণে রচিত। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিরচিত। শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই কোনো মৎসর স্মার্তদের দ্বারা রচিত 'দেবী ভাগবত' বলে একটি পুঁথিকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাত্ত্বত পুরাণগণ এরকম কাল্পনিক নবীন পুঁথিকে 'পুরাণ' বলে স্বীকার করেননি।

অনেকে বলেন, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যেহেতু দেবী ভাগবতের টীকা রচনা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই দেবী ভাগবত সুপ্রাচীন, এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতেরও

পূর্বের। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীপাদ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। মহাভারতের টীকায় গীতা ব্যাখ্যা প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শ্রীধর স্বামীকে গুরুজ্ঞানে প্রণাম করেছেন–

প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্গুরান্।
সম্প্রদায়ানুসারেন গীতাব্যাখ্যাংসমারম্ভে ॥

আর মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও আধুনিক দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয়েই একব্যক্তি নন। সম্পূর্ণ পৃথক। মহাভাতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধর বংশ গোবিন্দ সূরির পুত্র, আর দেবী ভাগবতের টীকাকার রঙ্গনাথের পুত্র এবং শৈবোপাসক। ভাবদীপে নীলকণ্ঠ এই রূপ পরিচয় পাওয়া যায় "দুতি শ্রীমৎপদবাক্য প্রমাণ মর্যাদাধুরন্ধর চতুর্দ্ধর বংশাবতংস-গোবিন্দসূরি সূন্যে নীলকণ্ঠস্য কৃতো ভারত ভাবদীপে। কিন্তু দেবী ভাগবতের টীকাকার তার যে পরিচয় প্রদান করেছেন তা অন্যরূপ–

শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীংমাতরং দেশিকোত্তমাম।
পিতরং রঙ্গনাথায্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে ॥
রত্নজীপ্রেরিতেনৈব পুরাণান্যবলোক্য চ।
শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ ॥

বহু সুপ্রাচীন আচার্য ও সর্ব সম্প্রদায়ের আচার্য এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের শতাধিক টীকা রচনা করেছেন, কিন্তু কেবল আধুনিক শৈবোপাসক নীলকণ্ঠের দেবী ভাগবত টীকা ব্যতীত অন্য কোনো টীকার নামও শোনা যায় না। পরন্তু দেবী ভাগবতের টীকাকার লিখেছেন– দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ। ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকায্যং মহত্তরম্ ॥

দেবী ভাগবতের আর দ্বিতীয় টীকা না থাকায় তিলক নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দেবীভাগবতেও ভাগবতের ন্যায় বহু উক্তি দেখা যায়। কিন্তু দেবীভাগবতে ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী পূজার কথা রয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণে কোথাও তো এরূপ লৌকিক দেবীগণের উপাসনার কথা নেই। সুতরাং, এটি কখনো বেদসার হতে পারে না। বেদান্তে 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ' (২/২/৪২) অধিকরণে এরকম শাক্ত মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে।

দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। তারপর মুম্বাই ভেঙ্কটেশ্বর প্রেসে ছাপানো হয়। এজন্য উক্ত প্রেসের প্রকাশক লিখেছেন যে, পুস্তকান্তরের অভাবে তিনি দেবীভাগবতের পাঠ সংশোধন করতে পারেননি।

আবার কেউ কেউ বলেন, শংকরাচার্য তো শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা বা এর থেকে

কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেননি। তবে নিশ্চিত, এটি শংকরাচার্যের পরে রচিত হয়েছে। কিন্তু দেখুন, শঙ্করাচার্য ভগবানের যে আদেশ মান্য করতে এরূপে এসেছিলেন, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করলে তা কীভাবে সিদ্ধ হবে। তাছাড়া তিনি তো দেবী ভাগবতের টীকা বা কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেননি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তিনিও তো দেবীভাগবতের কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করেননি।

সুতরাং ভাগবত বলতে শ্রীমদ্ভাগবতই বোঝায়। ঠিক যেমন ভগবান বলতে শ্রীহরিকেই বোঝায়; চন্দ্র, সূর্য, গণেশ নয়। দেবী ভাগবত প্রণয়ন ও প্রচারের চেষ্টা হিংসাত্মক প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র।

✵ ব্রজগোপীকাগণ কেন দুর্গাপূজা করেছিলেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার আশায় গোপীদের কাত্যায়নী ব্রতের উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীশুক উবাচ

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥১॥
আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেহরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥২॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥৪॥

শুকদেব গোস্বামী বললেন, হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তারা কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন, সূর্যোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তারপর তাঁরা ঘঁষা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারী, নব পল্লব, সুগন্ধ মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।

"হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তিধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন।

আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।" এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণ প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, এই শ্লোকে উল্লিখিত দেবী দুর্গা বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া নন, বরং যোগমায়ারূপে পরিচিত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। অনেকে মনে করেন 'মহামায়া' ও 'দুর্গা' শব্দে বহিরঙ্গা শক্তিকেই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তা সত্য নয়। বৃন্দাবনে গোপীগণ সেই অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকেই আরাধনা করেছিলেন।

আর যদি কেউ বলে যে, গোপীগণ বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তাতেই বা ক্ষতি কীসে? গোপীদের কী উদ্দেশ্য ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে। সাধারণত মানুষ দুর্গাপূজা করে কোনো জাগতিক লাভের আশায়। কিন্তু গোপীগণ এখানে কৃষ্ণকে লাভ করার আশায় দুর্গাপূজা করেছিলেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা যেকোনো উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত ছিলেন। সেটিই ছিল গোপীদের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভের আশায় তাঁরা পুরো একমাস যাবৎ দুর্গাপূজা করেছিলেন। আমরা যদি মুর্খের মতো তাঁদের কার্যাবলিকে কোনোভাবে জাগতিক মনে করি, তবে কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

✵ অর্জুন কর্তৃক দুর্গাস্তবের কী কারণ ছিল?

মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "হে রাজন, শ্রীবাসুদেব দুর্যোধনের সৈন্যদের যুদ্ধ উদ্যত দেখে অর্জুনের কল্যাণ কামনায় বললেন, 'হে মহাবাহু অর্জুন, শত্রুদের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রাম অভিমুখ হয়ে দুর্গার স্তব কর।"

অর্জুন তখন শ্রীবাসুদেবের বাক্য অনুসারে রথ থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্গা স্তোত্র আরম্ভ করলেন– "হে কৃষ্ণপিঙ্গলে, কাত্যায়নী, শিখিপুচ্ছধ্বজ ধরে, হে গোপেন্দ্রানুজে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে, হে পীতবাসীনি, হে কৃষ্ণে, হে কৈটভনাশিনি, আপনাকে প্রণাম। হে ভগবতি দুর্গে, আপনি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী বেদমাতা ও বেদান্ত। আমি বিশুদ্ধ অন্তরে আপনাকে স্তব করছি। আপনার কৃপায় এই মহারণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ করতে সমর্থ হই। আপনি ভক্তদের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গম পথে, ভয়স্থানে, দুর্গম স্থানে, পাতালে নিত্য বাস করে থাকেন, আর যুদ্ধে দানবদের পরাজিত করে থাকেন। আপনি জৃম্ভনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা প্রভাতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্যবিবর্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে দর্শন করে থাকেন।"

হে রাজন, অর্জুনের ভক্তি দেখে ভগবতী দুর্গা অন্তরীক্ষে দর্শন দিয়ে বললেন–

স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রুন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।
নরস্তমসি দুর্দ্ধর্ষ! নারায়ণসহায়বান্।
অজেয়স্ত্বং রণেহরীণামপি বজ্রভূতঃ স্বয়ম্॥
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ২৩.১৮)

"হে বীর পাণ্ডব, তুমি অল্পকাল মধ্যেই শত্রুদের পরাজিত করবে। **কারণ, স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গেই রয়েছেন**। অতএব, অন্য শত্রুর কী কথা! স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করতে সমর্থ হবে না।"

একথা বলে দেবী দুর্গা অন্তর্হিত হলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বর পেয়ে জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হয়ে রথে আরোহণ করলেন। তারপর কৃষ্ণের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নিজের শঙ্খ ধ্বনিত করতে লাগলেন।

সঞ্জয় বললেন, "হে রাজন, আমি শ্রীব্যাসদেবের কৃপা প্রভাবে জেনেছি, এই অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বযুগে নর-নারায়ণরূপে ধরাতলে প্রকাশিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টচিত্ত ক্রোধের বশবর্তী আপনার পুত্ররা মোহবশত তাঁদের জানে না। হে রাজন, ব্যাসদেব, নারদ মুনি, কণ্ব মুনি, শ্রীপরশুরাম আপনার পুত্র দুর্যোধনকে অর্জুন ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আপনার কোপন-স্বভাব দুরাত্মা পুত্ররা কালপাশে বদ্ধ হয়ে মোহগ্রস্ত হয়েছে, তাই তাঁদের সময়োচিত নির্দেশ তারা গ্রহণ করেনি। আমি পরিষ্কার দর্শন করছি যে, যেখানে ন্যায়, তেজ, কোমলতা, লজ্জা, বুদ্ধি ও ধর্ম থাকে, সেখানেই কৃষ্ণ থাকেন; যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়– *যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণ যতো কৃষ্ণস্ততো জয়।*"

এখানে অর্জুনকে দুর্গা নিজেও বলছেন– যেহেতু, স্বয়ং নারায়ণ তথা শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ***(নারায়ণসহায়বান্)***, সুতরাং অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু শাক্তরা কৌশলে এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সর্বশেষ শ্লোকে (১৮.৭৮) বলা হয়েছে–

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

অর্থাৎ, "যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।"

সুতরাং, বিজয়ের জন্য অর্জুন কর্তৃক দুর্গাস্তবের কোনো আবশ্যকতা বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জয়-পরাজয়ের তথা কর্মফলের আশা ত্যাগ করে কর্তব্যবোধে ও তাঁর (কৃষ্ণের) সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যুদ্ধ করতে বলেছেন। তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা করতে বলেছেন।

প্রশ্ন হলো, ভগবান তো স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে পারতেন, আমার স্তুতি করো। তা না বলে ভগবান কেন অর্জুনকে দুর্গাস্তুতি করতে বললেন? "আমার স্তুতি করো", "আমার শরণাগত হও" – এ ধরনের কথা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বহুবার বলেছেন। যেমন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।* অর্থাৎ "তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো।" তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন দুর্গাদেবী যেহেতু এ জড়জগৎরূপী দুর্গের অধিকর্ত্রী, পরম বৈষ্ণবী এবং সেই সাথে অসুরনাশিনী, তাই মহাভারতের যুদ্ধের মতো এমন মহৎ কর্মযজ্ঞে দুর্যোধনাদি কৌরবদের মতো অসুরদের বিনাশের পূর্বে, জড়জগৎরূপী দুর্গের)অধিকর্ত্রী হিসেবে দুর্গাদেবীকে মর্যাদা দান এবং পরম বৈষ্ণবী হিসেবে অর্জুন যেন তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, সেজন্যই অর্জুনকে তিনি দুর্গাদেবীর স্তুতি করতে বলেছিলেন।

এখানেও প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এখানে উল্লিখিত দেবী দুর্গা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া নন, বরং যোগমায়ারূপে পরিচিত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, যিনি নন্দপত্নী যশোদার কন্যা (*গোপেন্দ্রানুজে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে*) তথা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাছাড়া, কারো স্তবস্তুতি করার অর্থ এই নয় যে, তিনিই তার আরাধ্য। ভগবানের ভক্তরাও দেবতাদের শ্রদ্ধা, পূজা নিবেদন বা স্তুতি করেন। তাতে তাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বা সমর্পণের কমতি হয় না। তাই অর্জুন দুর্গাদেবীর স্তুতি করলেও তা দোষনীয় নয়।

দেবদেবীগণ যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁদের পূজা করা পরোক্ষভাবে ভগবানেরই পূজা করা হলেও তা যথার্থ বিধিসম্মত নয়– *অবিধিপূর্বকম্*। কারণ, সাধারণত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সকামকর্মীরাই জড় বিষয় লাভের বাসনায় দেবদেবীদের পূজা করে থাকে। প্রকৃত বিধান হলো সরাসরি ভগবানের পূজা করা। দেবদেবীদের পূজা যদি কেউ করতেও চান, তবে তার উদ্দেশ্য কোনো জড়বিষয় লাভের পরিবর্তে কেবল ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভ বা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করা উচিত; ঠিক যেমন, ব্রজগোপিকারা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন। শুধু তাঁরাই নন, অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্যই দুর্গাস্তব করেছিলেন। কৃষ্ণ সন্তুষ্টি এই অর্থে, যেহেতু কৃষ্ণ তা চেয়েছিলেন। আর উপরে উল্লেখিত কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা চেয়েছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শত্রুদের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব করো, কিন্তু এটা ছিল অর্জুনকে গীতাজ্ঞান দানের পূর্বে, যখন অর্জুন জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, যিনি দুর্গাদেবীরও আরাধ্য। সাধারণত জড়বিষয় সুখ লাভের জন্য

মানুষ দুর্গাপূজা করে। অর্জুনও সেখানে একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকায় উপনীত ছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে তাঁর প্রতি পূর্ণ শরণাগত হননি। তাই গীতাজ্ঞান দানের পূর্বে দুর্গার শ্রীমুখ থেকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশের সূচনা করলেন যে, পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের তথা সমস্তকিছুর তিনিই মূল কারণস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণ। তাই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। শত্রু পরাজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সান্নিধ্যই যে মূল প্রয়োজন, তা দেবী দুর্গাই বলেছেন। তাই ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম উপদেশ ছিল–

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥১৮.৬৫॥

"তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। তাহলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এজন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮.৬৬॥

"সর্ব প্রকার জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।"

✵ কৃষ্ণপূজা এবং দুর্গাপূজা কি এক?

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক *অল্পমেধসাম (গী.৭/২৩)* যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে লোক ঠকায়, তারা সমস্ত দেবদেবীকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে এবং তাদের ভ্রান্ত প্রচারের ফলে জনসাধারণও সেকথা সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এসমস্ত দেবদেবী ভগবানের বিভিন্ন রূপ নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশবিশেষ। ভগবান হচ্ছেন এক, আর অবিচ্ছেদ্য অংশেরা হচ্ছেন বহু। বেদে বলা হয়েছে, *নিত্যনিত্যানাম* ভগবান হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর।" বিভিন্ন দেবদেবীও হচ্ছেন শক্তিপ্রাপ্ত যাতে তাঁরা এই জড় জগৎকে পরিচালনা করতে পারেন। এসমস্ত দেবদেবী হচ্ছেন জড়জগতের বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীব (নিত্যানাম্), তাই কোনো অবস্থাতেই তাঁরা ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। শুক্লযজুর্বেদ (৩২/৩) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/১৯) তাই বলা হয়েছে, ন তস্য প্রতিমা অস্তি অর্থাৎ তাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের) সমান বা তুল্য কেউ নেই। যে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীনারায়ণ ও বিভিন্ন দেবদেবী একই পর্যায়ভুক্ত, তার কোনোরকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই। এমনকি দেবাদিদেব

মহাদেব এবং আদি পিতামহ ব্রহ্মাকেও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভগবানের সেবা করেন (শিববিরিঞ্চিনুতম্); কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব সমাজে অনেক নেতা আছে, যাদের মূর্খ লোকেরা 'ভগবানে নরত্ব আরোপ'– এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অবতার জ্ঞানে পূজা করে। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি এ জড় জগতে নাম, বিগ্রহ বা স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হলেও জড় জগতের তত্ত্ব নন। তিনি জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতে নিত্য অবস্থান করেন।

এমনকি মায়াবাদ দর্শনের প্রণেতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, নারায়ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের অতীত। কিন্তু সাধারণ লোকেরা (হৃতজ্ঞান) তা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক ফল লাভ করার আশায় বিভিন্ন জড় দেবদেবীর পূজা করে চলে। এসমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারে না, বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করার ফলে যে ফল লাভ হয়, তা অনিত্য। যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানেরই সেবা করেন। তুচ্ছ ও অনিত্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন। জড়া প্রকৃতির বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে এসমস্ত দেবদেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দেবদেবীদের দেওয়া বরও হচ্ছে জড় এবং অনিত্য। জড় জগৎ, জড় জগতের বাসিন্দা, এমনকি বিভিন্ন দেবদেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা সকলেই হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বুদবুদের ন্যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এজগতের মানবসমাজ ভূসম্পত্তি, পরিবার পরিজন, ভোগের সামগ্রী আদি অনিত্য জড় ঐশ্বর্য লাভের আশায় উন্মাদ। এই প্রকার অনিত্য বস্তু লাভের জন্য মানবসমাজে কেউ-কেউ বিভিন্ন দেবদেবীর অথবা শক্তিশালী কোনো ব্যক্তির পূজা করে। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে পূজা করে যদি ক্ষমতা লাভ করা যায়, সেটিকে তারা পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই তারা সকলেই তথাকথিত নেতাদের দণ্ডবৎ প্রণাম করছে এবং তার ফলে তাদের কাছ থেকে ছোটখাটো কিছু আশীর্বাদও লাভ করছে। এসমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা জড় জগতের দুঃখকষ্ট থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবার জন্য ভগবানের শরণাগত হতে আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য ব্যস্ত এবং তুচ্ছ একটু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য তারা দেবদেবীর আরাধনার প্রতি আকর্ষিত হয়। খুব কম মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের শরণাগত হয়। অধিকাংশ মানুষই সর্বক্ষণ চিন্তা করছে– কীভাবে আরো বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। আর এসমস্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে গিয়ে 'এটা দাও', 'ওটা দাও' বলে কাঙ্গালপনা করে তাদের সময় নষ্ট করছে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য–

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাগবত ৪/৩১/১৪)

বৃক্ষমূলে জলসেচন করলে যেমন সেই গাছের কাণ্ড, ডাল, উপখাশা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তিলাভ করে এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সমস্ত দেবতার পূজা হয়ে যায়। তখন ভগবানের বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন। তাই কখনো দেবদেবী-পূজাকে ভগবদ্ভক্তির সমকক্ষ মনে করা উচিত নয়।

পরমেশ্বর ভগবানকে বাদদিয়ে দুর্গাপূজার ফলে খুব বেশি হলে কৈলাশধাম প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বা গোলোকধামে গমন সম্ভব নয়। *মাহেশ্বরা রাজসী চ বলিদানসমন্বিতা। শাক্তাদয়ো রাজসাশ্চ কৈলাসং যান্তি তে তয়া ॥* (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৬৪.৪৮॥ *তাই দেবী দুর্গারই নির্দেশে* সুরথ রাজা অন্তিমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করেছিলেন এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শাক্তগণ বলেন, "যিনি কালী বা দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ"। শাস্ত্রানুসারে, দেবী কালী ভগবানের শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। আগুন তাপ ও আলো উভয় শক্তির উৎস। অর্থাৎ, তাপ ও আলো শক্তি দুটো আগুনের প্রকাশ– আগুন শক্তিমান, তাপ ও আলো শক্তি। তেমনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি হলো অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি। দেবী কালী হলেন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দুর্গার উগ্ররূপা প্রকাশ, যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সংহারকার্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে–

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (১.৯০) কালী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'কৃষ্ণভক্তা, কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ।

কৃষ্ণভাব নয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী'।

অর্থাৎ, "দেবীকালী তেজ ও গুণ বিক্রমে কৃষ্ণতুল্যা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণা তথা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত (বৈষ্ণবী)। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের

ভাবনাবশত কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন।"

ভক্তের মধ্যে ভগবানের সমস্ত দিব্যগুণ বিকশিত হয়, তথাপি ভক্ত ও ভগবান দুই ভিন্ন সত্ত্বা। ভগবান সেব্য, আর ভক্ত হলেন তাঁর সেবক। তেমনি দেবীকালী হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা। *একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥* সুতরাং, কালী তথা দুর্গা ও কৃষ্ণ এক নয়।

দেবী কালীর পরিচয়

বঙ্গদেশে শক্তিপূজার সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় রূপ হলো দেবী কালিকা। এজন্য বিভিন্ন দেশে আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপে পূজার প্রাধান্য প্রসঙ্গে ব্রহ্মযামলে উল্লেখিত আদ্যাস্তোত্রে বলা হয়েছে– 'কালিকা বঙ্গদেশে চ, অযোধ্যায়ং মহেশ্বরী'। অবশ্য কালীমাতার এই প্রভাব বুঝতে আমাদের শাস্ত্র পর্যন্ত না গেলেও চলবে; যেকোনো এলাকার প্রধান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দিরটি সাধারণত কালী মন্দির, যা বাঙালি সংস্কৃতিতে কালীর শক্তিশালী প্রভাবকেই চিহ্নিত করে। ভারতের অন্য অঞ্চলে কালী মন্দিরের এতো আধিক্য চোখে পড়ে না।

'কালী' শব্দের অনেক রকম অর্থ পাওয়া যায়। একটি অর্থে কালী অর্থ ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। আবার, যিনি কালস্বরূপা, প্রলয়কালে যিনি কালরূপে জগৎকে গ্রাস করেন, তিনিই কালী। আবার, যিনি মহাকালের (শিব) প্রকৃতিস্বরূপা, তিনিই মহাকালী। আরেক অর্থে, যিনি কালকে কলন করেন, তিনিই কালী। দেবী দুর্গা ও কালী দু'জনেই অভিন্ন, দু'জনেই আদ্যাশক্তির দুটি রূপ মাত্র; রজোগুণে দুর্গা এবং তমোগুণে তিনি কালীরূপা। তাইতো বলা হচ্ছে- "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।"

দেবীকালীর উগ্রমূর্তির তাৎপর্য

দেবী কালীর রূপটি বিচিত্র– কারো কাছে ভয়ংকরী, কারো কাছে মাতৃস্বরূপিণী, আবার, কারো কাছে কৌতুকের, বিশেষ করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবীর এই রূপ বিভ্রান্তির বিষয়বস্তুও বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দেবীর এই রূপের মধ্যে এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক রহস্য লুকিয়ে আছে।

চতুর্ভুজা

দেবীর ডান দিকের উপরের হাতে আছে বরমুদ্রা, যা দ্বারা তিনি ভক্তকে তার মনোবাঞ্ছা অনুসারে বর দান করছেন এবং নিচের হাতে অভয়মুদ্রা মুদ্রা, যা দ্বারা তিনি দৈত্যভয়ে ভীত জীবকে অভয় দিচ্ছেন। বা দিকের উপরের হাতে আছে সুতীক্ষ্ণ খড়গ, যা দিয়ে তিনি অসুর বিনাশ করে ভক্তদের রক্ষা করছেন, আরো গভীর

অর্থে, জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা অজ্ঞানতারূপ তমোগুণকে ছিন্ন করছেন। নিচের দিকে অবশিষ্ট হাতে সদ্যছিন্ন মুণ্ড, যা দ্বারা তিনি অসুর তথা আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিষ্ঠুর পরিণতি দেখাচ্ছেন। দেবীর চতুর্ভুজা রূপ চতুবর্গ তথা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদায়িণী।

❋ দিগম্বরী ও মুণ্ডমালাধারিণী

দেবী কালীর একাধিক রূপভেদ বিভিন্ন শাস্ত্রে দেখা যায়। কোথাও তিনি রক্ত বর্ণের বস্ত্র ও সর্ব অলংকার ভূষিতা, কোথাও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, আবার, কখনোও দিগম্বরী, কেবল মুণ্ডমালা ও কাটা হস্তের মেখলা বা কোমরবন্ধনী ধারণ করে আছেন।

প্রকৃতপক্ষে, অসুরেরা যখন দেবী দুর্গার তেজময় অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত যুদ্ধং দেহী রূপ দেখার পরও সেই রূপে বিমোহিত হয়ে পড়ার ফলে যুদ্ধ করতে পারছে না, তখন দেবী তাদের বলেন তাঁর উগ্ররূপা কালিকার সাথে যুদ্ধ করতে। এই কালিকা দিগম্বরী হলেও তার রূপ এমন ভয়ংকর যে, অসুরেরা তাঁর এই রূপ দেখার পরও কামমোহিত হওয়া তো দূরের কথা, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন দেবী কালিকা তাদের গ্রাস করেন।

আবার, অন্য অর্থে প্রলয়কালে জীবকূল ধ্বংস হলে কেবল তাদের অস্থি আর নরকংকালই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কারিণী শক্তি কালী তাই কেবল অস্থি, নরমুণ্ড, আর কংকাল দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করেন। যেহেতু কালী প্রলয়কারিণী এবং তমোগুণকে স্বীকার করেন, তাই তিনি সুন্দর বস্ত্র আদি অলংকার দিয়ে সাত্ত্বিকী বা রাজসিকী রূপ নেবেন না, এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া কালী যেহেতু ভগবতীর উগ্রশক্তি, তাই যুদ্ধকালে তিনি এতটাই উগ্রতেজ ধারণ করেন যে বস্ত্র, আভরণ, অলংকার তার গায়ে থাকা সম্ভব নয়।

আমরা দেখি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আদি বিখ্যাত মাতৃসাধকেরা এই দিগম্বরী কালীর সাধনা করেই কামরিপুকে জয় করেছেন। তাইতো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীতে গেয়েছেন- "বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্‌বসন। কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যারে আলোর নাচন।" প্রকৃতপক্ষে, মাতা সর্বদিক ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাই তিনি দিগম্বরী (দিককে যিনি অম্বর করেছেন)।

❋ শিববক্ষে চরণ এবং জিহ্বায় কামড়

মাতা কালী তাঁর মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তরাজি দ্বারা রক্তলাল জিহ্বা কামড় দিয়ে আছেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, অসুর সংহারে মত্ত কালী ক্রোধে তাঁর খড়গ দ্বারা নির্বিচারে অসুরকূলকে সংহার করতে লাগলেন। তখন উমাপতি শিব অসুরকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, সর্বোপরি দেবী কালিকাকে শান্ত করে জগতের ভারসাম্য

রক্ষার জন্য যে পথ দিয়ে দেবী অসুর সংহার করতে করতে আসছিলেন, সেই পথে শায়িত হন। তখন দেবী কালী অজ্ঞাতসারে চলতে চলতে মহাদেবের বক্ষে তাঁর চরণ রাখেন। তৎক্ষণাৎ পতিপরায়ণা দেবী স্বীয় পতির গায়ে চরণ রেখেছেন দেখে লজ্জায়, অনুশোচনায় জিহ্বায় কামড় দেন। যেহেতু এই রূপেই উগ্র কালিকা শান্ত হন, তাই এই জিহ্বা কামড়ে থাকা, শিববক্ষে দণ্ডায়মান রূপটিকে ভক্ত কল্যাণকারিণী রূপ হিসেবে পূজা করা হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মা সত্ত্বগুণরূপা শুভ্র দন্তরাজি দ্বারা রজোগুণরূপ লাল জিহ্বাকে কেটেছেন। জিহ্বা লোলুপতার প্রতীক। তাই মায়ের এই ভাব আমাদের সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ তথা লোভ, লালসা, অহংকার, কামনাকে দমন করার শিক্ষা দেয়।

❋ ত্রিনয়নী ও মুক্তকেশী

দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্র বলছে- 'শবারূপ মহাভীমাং মুক্তকেশী চর্তুভুজাম্' অর্থাৎ মা মুক্তকেশী। এই মুক্তকেশ বৈরাগ্যের প্রতীক। তাঁর ত্রিনয়ন তিনটি কাল-অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের প্রতীক। আবার, দেবী ত্রিগুণময়ী সত্ত্ব, রজো, তমো গুণ-স্বরূপা (গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্তু তে)।

❋ বঙ্গদেশ কালীপূজা

বাংলায় কার্তিকী অমাবস্যার দীপাবলিতে কালী পূজা প্রচলিত, যদিও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দীপাবলিতে লক্ষ্মীপূজা হয়। কলকাতার বিখ্যাত মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম কালীঘাট মন্দিরে দীপাবলির দিন দেবী কালীকে মহালক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়। যদিও প্রাচীনকাল থেকেই কালী আরাধনা চলে আসছে, তবুও দীপাবলির এই কালী পূজার প্রবর্তন করেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, যিনি কৃষ্ণনগরের শাক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার পণ্ডিত ছিলেন। সকল অমাবস্যা তিথিই কালীপূজার জন্য প্রশস্ত। দুর্গাপূজার অষ্টমীতে যে সন্ধিপূজা হয় (অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণ) তখন আসলে দুর্গামূর্তিতে কালীর ধ্যান করে কালীর পূজা হয়। এটি সেই তিথি, যে তিথিতে দেবী দুর্গার প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর ললাট থেকে তেজ নির্গত হয় এবং সেই তেজ হতে দেবী কালী আবির্ভূতা হন অসুর বিনাশের জন্য। কালীর একাধিক রূপভেদ আছে যেমন- দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, সিদ্ধকালী, মহাকালী, রক্ষাকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি। তবে গৃহে বা মন্দিরে সাধারণ ভক্তদের জন্য দক্ষিণাকালী পূজা করার নিয়ম, অন্যরূপগুলো সাধক বা তন্ত্রমতে পূজা করা উচিত বলে মনে করা হয়। শিবহৃদয়ে দক্ষিণচরণ বা ডান পা স্থাপন করেছেন বলে এই কালীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়, অন্যদিকে বাম পা সামনে থাকলে তা শ্মশানকালী বা অন্যান্য রূপ; যা গৃহীদের বা সাধারণ নিয়মে পূজা করা অমঙ্গলজনক। প্রধানত তন্ত্র সাধকেরা এই বামাকালীর পূজা করেন।

❋ দেবীকালী পরম বৈষ্ণবী

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (১.৯০) কালী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'কৃষ্ণভক্তা, কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ।
কৃষ্ণভাব নয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী'।

অর্থাৎ, "দেবীকালী তেজ ও গুণ বিক্রমে কৃষ্ণতুল্যা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণা তথা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত (বৈষ্ণবী)। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনাবশত কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন।"

ভক্তের মধ্যে ভগবানের সমস্ত দিব্যগুণ বিকশিত হয়, তথাপি ভক্ত ও ভগবান দুই ভিন্ন সত্ত্বা। ভগবান সেব্য, আর ভক্ত হলেন তাঁর সেবক। তেমনি দেবীকালী হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা তথা পরম বৈষ্ণবী।

❋ দেবীপূজায় পশুবলি প্রসঙ্গ

বেদে উল্লেখিত যজ্ঞে পশুবলির দোহাই দিয়ে দুর্গা, কালী, মনসা প্রভৃতি দেবীপূজায় প্রাণিহত্যা আর মদ-মাংস খাওয়ার প্রতিযোগিতা আজ তথাকথিত সনাতন সংস্কৃতির রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলিযুগের ধর্মভ্রষ্ট, উগ্র ও পিশাচগুণসম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের তামসিকতার অনুকূলে উগ্ররূপা কালী-মূর্তির আরাধনা করে এবং মাংসলোলুপতা চরিতার্থ করতে পশুবলি দেয়। তারা কালী-দুর্গাকে বৈষ্ণবীরূপে না দেখে রক্তপায়ী রূপেই দেখে। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন (ভা.৫/৯/১৮-তাৎপর্য), "আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীপূজা করে। কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। বস্তুত, প্রতিমার সম্মুখে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।" কেননা, দেবীদুর্গা জগজ্জননী এবং কালীসহ অন্যান্য দেবীগণ সেই মাতৃস্বরূপেরই বিভিন্ন প্রতিমূর্তি। জগতের সমস্ত জীবই তাঁর সন্তান। মাতা হয়ে এক সন্তানের দ্বারা অপর সন্তানের বধ তিনি কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন? শিবপুরাণে উল্লেখিত আছে, মাতা পার্বতীকে শিবজী পশুবলি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন তদোত্তরে দেবী পার্বতী বলেন– ***মম দ্বারে, মম যজ্ঞে যো নরা পশুধাপোকা। তে নরা নরকাযান্তি যাবৎ চন্দ্র সূর্য দিবাকরম।*** অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার মন্দির প্রান্তে ও আমার যজ্ঞে পশুবলি দেয়, সেই ব্যক্তি ততদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, যতদিন এই পৃথিবীতে চন্দ্র, সূর্য বিদ্যমান।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের, প্রকৃতিখণ্ডে (৬৪.৪৫-৪৯) বলা হয়েছে–

সাত্ত্বিকী তামসী চৈব ত্রিধা পূজা চ রাজসী।
ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমা মধ্যমা ॥৪৫॥

সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদীনাঞ্চ রাজসী।
অদীক্ষিতানামসতাং বন্যনাং তামসী স্মৃতা ॥৪৬॥
জীবহত্যাবিহীনা যা বরা পূজা চ বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবাযান্তি গোলকং বৈষ্ণবীবরদানতঃ ॥৪৭॥
মাহেশ্বরা রাজসী চ বলিদানসমন্বিতা।
শাক্তাদয়ো রাজসাশ্চ কৈলসং যান্তি তে তয়া ॥৪৮॥
কিরাতা নরকং যান্তি তামস্যাং পূজয় তথা ॥৪৯॥

"ভগবতী দুর্গার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী– এই তিন প্রকার উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা পূজা আছে। এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সাত্ত্বিকী পূজা ও শাক্তদিগের রাজসী, আর অদীক্ষিত পশুতুল্য অসাধুদের পূজাকে তামসী বলা হয়। জীবহত্যাবিহীন শ্রেষ্ঠ পূজা বৈষ্ণবী; বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণবীর আশীর্বাদে গোলকধামে গমন করে। আর কিরাত তথা নিম্নচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তামসী পূজায় নরকে গমন করে।"

তাই পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে (৩৯.৩৪) বলা আছে–

সৌবর্ণাং রাজতীং বাপি বিষ্ণুরূপা বলিং বিনা।
হিংসাদ্বেষৌ ন কর্তব্যৌ ধর্মাত্মা বিষ্ণুপূজকঃ ॥

"সুবর্ণময়ী বা রজতময়ী বিষ্ণুস্বরূপা দেবী মহামায়াকেও ছাগাদি বলিদান ব্যতীত পূজা করবে। ঐ সময়ে ধর্মাত্মা বিষ্ণুপূজকের দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।"

❋ বেদে কেন পশুবলির বিধান দেয়া হয়েছে?

প্রশ্ন হতে পারে, পশুবলি যদি বেদ নির্ধারিত হয়, তবে তাতে দোষ কী? এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বেদে নির্ধারিত সব আচরণবিধি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। সত্ত, রজো ও তমো– এ ত্রিগুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির জন্য আচরণ বিধিও ভিন্ন ভিন্ন। বেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গের কথা বলা হয়েছে। যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে সরাসরি নিবৃত্তির পন্থা গ্রহণে অসমর্থ, সেসব প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে শাস্ত্রে কিছু নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুমোদন রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৩) বলা হয়েছে– "মদ্যপানের পরিবর্তে মদের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণ, যথেচ্ছা পশুবলির পরিবর্তে যজ্ঞে পশু ব্যবহার, ইন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্তে শুধু সন্তান উপাদনের জন্যই মৈথুন কার্য বিহিত। কিন্তু স্বেচ্ছাচারীরা এমন বিশুদ্ধ স্বধর্ম অবগত হয় না।" তাই তারা নির্বিচারে প্রাণিহত্যারূপ পাশবিক কর্মে লিপ্ত হয়।

মহাভারতে শান্তিপর্বের ২৬৫নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের

বিচখ্যুনৃপ সংবাদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "অহিংসাই সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেসকল মানুষ যজ্ঞে পশু হত্যা করে বৃথা মাংস ভোজন করে, তাদের সে কর্ম নিন্দনীয়। ধূর্তরাই মদ, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদে নির্বিচারে এসব ভক্ষণের বিধি নেই। বস্তুত, কাম, লোভ, মোহবশতই লোকদের এসব অমেধ্য দ্রব্যে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।"

প্রকৃতপক্ষে, বলি কথাটির অর্থ হলো বিসর্জন বা উৎসর্গ, কেবল পশুহত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ নয়, বরং পশুকে নিমিত্ত করে কাম, ক্রোধ, লোভাদি হৃদয়ের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে বিসর্জন দেয়া। তাছাড়া, বৈদিক যজ্ঞ কোনো সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। বৈদিক আচারসম্পন্ন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের আহ্বানে যজ্ঞে স্বর্গের দেবতারা অংশগ্রহণ করতেন, যজ্ঞবিধি অনুসারে কখনো কখনো যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়া হতো। কিন্তু এই প্রকার পশুবলি মাংসাহারের জন্য নয়, পক্ষান্তরে বৃদ্ধ পশুকে নতুন ও উন্নত জীবন দান করার জন্য এবং বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য। কখনো কখনো গবেষণাগারে ছোট ছোট পশুদের ওপর ঔষধের প্রভাব পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলে পশুদের মৃত্যু হয়। ওষুধের গবেষণাগারে পশুরা পুনরুজ্জীবিত হয় না, কিন্তু মনুসংহিতায় (৫/৪০,৪২) বলা হয়েছে যে, যজ্ঞস্থলে বলিকৃত পশু বৈদিক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে পুনরায় উন্নত দেহ লাভ করে–

যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রি তীঃ পুনঃ ।
আত্মানঞ্চ পশুশ্চৈব গময়ত্যুমাং গতিম্ ॥

তাই তা অন্যায় বা পাপকর্ম নয়। তামস প্রকৃতির মানুষদের জন্য, যাদের মাংস না খেলে চলেই না, তাদের জন্য শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে, অমাবস্যার গভীর রাতে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে মহামায়া দুর্গার উগ্ররূপা কালীমূর্তির সামনে একটি পাঁঠাকে বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করা। তবে এতে যে তাদের কোনোই পাপ হয় না, তা নয়। পশুরা মাংসাশী হলেও তাদের পাপ হয় না। কিন্তু মানুষ পশু নয়। তাই মহাভারত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ব্রাহ্মণের অনুমতি সাপেক্ষে এরূপ তামসিক যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস ভক্ষণে পাপ কম হয়। কিন্তু শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যখন তখন নিরীহ পশুদের বধ করে তাদের মাংসভক্ষণ শাস্ত্রে কোথাও অনুমোদিত নয়।

তদুপরি, মানুষ যেন নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যখন তখন নিরীহ পশুদের হত্যা করে মহাপাপের ভাগী না হয় এবং সেই সাথে ধীরে ধীরে তাদের পারমার্থিক উন্নতি হয় এবং সর্বোপরি মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই শাস্ত্রের এই বিধান। যেমন, কেউ যদি সিগারেটের প্রতি অত্যধিক আসক্ত থাকে, তবে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার হয়ত প্রথমাবস্থায় তাকে সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ত্যাগ করতে বললে তার পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই কারো যদি দৈনিক এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তবে তাঁকে প্রথমাবস্থায় পাঁচটি, তারপর তিনটি বা দুটি সিগারেটের অনুমোদন দিতে পারে। যাতে ধীরে ধীরে তিনি সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন।

সুতরাং, এমনকি মা কালীর সম্মুখে মাসে একবার যে বলির বিধান, তাও মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই অনুমোদিত। মনুসংহিতায় যে স্থলে মাংসভক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চরম সিদ্ধান্তস্বরূপ ৫ম অধ্যায়ের ৫৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারতাদি শাস্ত্রেও সেকথা বলা হয়েছে। মহাভারতে (অনুশাসনপর্ব ১১৫ অধ্যায়) বলা হয়েছে, "পূর্বকালে যাজ্ঞিকগণ পূণ্যলোকলাভে অভিলাষী হয়ে ব্রীহিসমুদয়কে (ব্রীহি=ধান) পশুরূপে কল্পিত করিয়া তা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। একসময় ঋষিগণ মাংসভক্ষণ বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হয়ে চেদিরাজ বসুর নিকট গমনপূর্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এ প্রশ্ন করলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। সে অপরাধের জন্য তাকে স্বর্গচ্যুত হয়ে ধরাতলে এবং পরে পাতালে প্রবেশ করতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করেন, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তার শ্রেয়।" মনুসংহিতায় (৫/৫৬) বলা হয়েছে,

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিং তু মহাফলা ॥

অর্থাৎ মাংসাহার, মদ্যপান এবং মৈথুনাচার বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এধরনের কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হলে তা এতটা দোষাবহ নয়, তবুও এগুলো থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।

অতএব, শাস্ত্রসমূহ রজো-তমোগুণাচ্ছন্ন লোকদের মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণীহত্যা আপাত অনুমোদন দিচ্ছে মনে হলেও, পরোক্ষভাবে সকলের জন্য তা নিষিদ্ধই করা হয়েছে।

বিশেষত এ কলিযুগে পশুদের নবজীবন দান করার মতো শক্তিশালী ব্রাহ্মণ নেই বললেই চলে। তাই কলিযুগের জন্য এসমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (কৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ড ১৮৫/১৮০) বলা হয়েছে– *অশ্বমেধং গবালম্ভং ...কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥* অর্থাৎ– "অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ...কলিযুগে নিষেধ।" তাই কলির প্রারম্ভে বুদ্ধদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান নিজেই জগতে অহিংসা ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস প্রায় সবার জানা।

✲ দুর্গাপূজায় অপসংস্কৃতির চর্চা

বর্তমান সময়ে এধরনের পূজা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ভক্তিচর্চার পরিবর্তে চলছে আচারসর্বস্ব সংস্কৃতির চর্চা। তা-ও ভালো হতো যদি সংস্কৃতিটা আদর্শ হতো; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তা ক্রমশ খারাপ হতে হতে অপসংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। পূজা নয়, যেন ডেকোরেশন আর লাইটিং-এর তুমুল প্রতিযোগিতা, উঠতি ছেলেমেয়েদের বিকৃত আনন্দ-উল্লাস। উগ্র শব্দে উগ্র গান চালিয়ে তারা মদ-গাঁজা খেয়ে অশালীন ভঙ্গিতে মায়ের সামনেই নৃত্য করে। যেকোনো সাধারণ ভদ্রলোকও সে নৃত্য দেখে মুখ না লুকিয়ে পারবেন না, তা উপভোগ করা তো দূরের কথা।

অপসংস্কৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে বর্তমানে যারা এভাবে মায়ের পূজা করছে, প্রকৃতপক্ষে একে পূজা বলা যায় না। বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও এভাবে মায়ের পূজা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেউ কি নিজের মায়ের সামনে মদগাঁজা খেয়ে এভাবে অশালীন ভঙ্গিতে নৃত্য করতে পারে? যে কারো মা, এমনকি বোনের সামনেও যদি কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে মাতলামি করে, অশালীন ভঙ্গিতে নৃত্য করে, তবে তা কি কেউ সহ্য করবে? তাহলে যিনি জগজ্জননী, তাঁর সামনে কি এমন আচরণ করা যায়? এটা কখনো মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হতে পারে না। এটা জগন্মাতাকে অপমান করা। অতিথি যদি জানতে পারে যে, তাকে বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করা হবে, তবে কি তিনি সেখানে যাবেন?

এমনকি পারিরিক বা সামাজিকভাবেও ভদ্রপরিবারে এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়। আর যদি তা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মন্দির, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই সবাই নির্মল পরিবেশ আশা করেন, সেখানে যদি এ ধরনের আচরণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা নিন্দনীয়। প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চা হলে সবাই সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, কিন্তু তা বিকৃত হলে, সকলেই ঘৃণা করবে, এটাই স্বাভাবিক।

তাই যদিও শ্রীবিগ্রহের বহু গুণ-মহিমা শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে, তবু, যদি যথাযভাবে বিগ্রহকে মর্যাদা না দেয়া হয়, তবে সেখানে দেবী অবস্থান করতে পারেন না। মন্ত্রপাঠ করে যতই আহ্বান করা হোক, বিধি মোতাবেক মায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হলে, তবেই মা মূর্তিতে অধিষ্ঠান করবেন। নচেৎ তা কেবল আড়ম্বর।

'পূজা' শব্দটি শোনা মাত্রই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে কোনো দেবপ্রতিমা বা ফুল-তুলসী-বিল্বপত্র ও শঙ্খ-ঘণ্টা দ্বারা সজ্জিত ধাতবপাত্র, আল্পনা, ঘট অথবা ধূপ-দীপ সমন্বিত আরতির দৃশ্য ইত্যাদি। তখন স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা

ও পবিত্রতা অনুভব হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে পূজা মানে পার্টি, বিনোদন বা উৎসবমাত্র। আবার, কারো কাছে পূজা মানে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোর আর নতুন পোশাক পড়ে ঘোরাঘুরি, সমাবেশ অথবা আড্ডা দেয়া। প্রকৃতপক্ষে পূজার অর্থ তাদের হৃদয়ঙ্গম হয়নি বলা যায়। পূজার উদ্দেশ্য হলো পূজনীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি। এ আয়োজন তখনই পূজার অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে, যখন তা উপাস্যের সন্তুষ্টি বিধান করবে, উপাস্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাযুক্ত হবে। বৈদিক সংস্কৃতিতে এমন আয়োজনই স্বীকৃত। তাই পূজা মানে শুধু আচারসর্বস্বতা নয়, সেখানে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির সমন্বয় থাকতে হবে।

✲ পূজা উদ্‌যাপনের আদর্শ সংস্কৃতি

তবে, আধুনিকতার সংস্পর্শে সবাই যে অপসংস্কৃতির চর্চা করছে, তা কিন্তু নয়। এখনো অনেকে রয়েছেন, যাঁরা খুব শুদ্ধতা সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন। তাহলে সঠিকভাবে দুর্গাপূজা করার ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়?

প্রথমত শাস্ত্রবিধি অনুসারে দেবীর বিগ্রহ তৈরি করতে হবে এবং সেই সাথে চাই প্রতিমাশিল্পী ও ব্রাহ্মণের শুদ্ধতা এবং সঠিকভাবে মন্ত্রপাঠ। পূজায় জাগতিক হিন্দি বা ইংরেজি গানের পরিবর্তে মায়ের বন্দনামূলক সংগীত বাজানো উচিত। পূজায় সাউন্ড সিস্টেমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মাকে তাঁর বন্দনা গীতি শোনানো, নিজেরা উগ্রভাবে নৃত্য করা নয়। ডেকোরেশন বা লাইটিং লোকের মনোরঞ্জন বা প্রতিযোগিতার জন্য নয়, মায়ের সন্তুষ্টি বিবেচনা করেই হওয়া উচিত। তাছাড়া পূজায় অবশ্যই শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। মদ্যপান ও সকল প্রকার নেশা বর্জন করা উচিত। অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন থেকে বিরত হওয়া উচিত। পূজাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজি যেন না হয়, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক পূজা কমিটির উচিত মায়ের সেবার গুণগত মান যেন নিশ্চিত হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা। এই নৃত্য, গীত, সাজসজ্জা, ভোজন ইত্যাদি বৈদিক সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও সবকিছুর উদ্দেশ্য উপাস্যদেবীর সন্তুষ্টিবিধানে হওয়া উচিত।

পূজার চাঁদার অর্থ ব্যক্তিস্বার্থে অথবা মদ-মাংসের পেছনে ব্যয় না করে, দেবতার উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা উচিত এবং পূজাবিধি আচরণের ক্ষেত্রে কারো মানসিক জল্পনা-কল্পনাকে গুরুত্ব না দিয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সবকিছু করা উচিত। কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম আসুরিক বলে গণ্য হয়। শাস্ত্রানুযায়ী কলিযুগে যজ্ঞে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেহেতু পশুকে পুনর্জীবন দান করা সম্ভব হয় না। তাই মাংসাহার, নেশা ইত্যাদি তামসিক আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জনপূর্বক শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাবে পূজা উদযাপন করা উচিত।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে।।

তামসিক যজ্ঞ উৎসবগুলো বিধিহীনম্– শাস্ত্রবিধি বর্জিত। *অসৃষ্টান্নম*– প্রসাদ বিতরণ করা হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েই আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করেন। যার ফলে মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে। অতএব, পূজাপার্বণে তামসিকতা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাবেই পূজা উদযাপন করা উচিত।

❋ পুরোহিত-ব্রাহ্মণের গুণাবলির মানদণ্ড

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।* "প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।" এবং স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে (গী.১৮/৪১)। ব্রাহ্মণের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাজম্ ॥ (গীতা. ১৮/৪২)

শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), তপ (তপস্যা), শৌচ (শুচিতা), ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা), সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য– এগুলো ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত গুণ বা কর্ম।

শূদ্রে চ তদ্ভবেল্লক্ষ্যা দ্বিজে চেচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
যত্রৈতল্লক্ষতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥
(মহাভারত, বনপর্ব ১৫১.২৫-২৬, যুধিষ্ঠিরবাক্য)

যুধিষ্ঠির বললেন, "শূদ্রে যদি এসকল লক্ষণ থাকে, তবে সে শূদ্রকুলোদ্ভূত হলেও শূদ্র নয়; আবার, ব্রাহ্মণের যদি লক্ষণ না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। যে পুরুষে এসকল গুণ দেখা যাবে, তিনি শূদ্রকূলোদ্ভূত হলেও তাকে ব্রাহ্মণ বলে জানবে এবং যে পুরুষে এসকল গুণ থাকবে না, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হলেও তাকে শূদ্র বলে নির্দেশ করবে।"

অর্থাৎ জন্ম অনুসারে নয়, গুণ এবং কর্ম অনুসারেই কারো বর্ণ নির্ধারিত হয়।

কিন্তু আজকাল পূজার ব্রাহ্মণ নির্বাচনে তা কি বিবেচনা করা হচ্ছে? ব্রাহ্মণ অবশ্যই চারটি পাপকর্ম যথা: আমিষাহার, নেশা, দ্যূতক্রীড়া (তাস, পাশা, জুয়া ইত্যাদি)

এবং অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন করবেন। অর্থাৎ, প্রথমত তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। রজো-তমোগুণে আচ্ছন্ন অসংযমী ব্যক্তির ন্যায় তিনি নিশ্চয়ই ছাগ-মহিষের মুণ্ডু আর অর্থাদির লালসায় কুশাসনে উপবেসন করবেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবেন তপস্বী, শুচি, সহিষ্ণু এবং সরলহৃদয়; শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী এবং ভগবানের প্রতি গভীর শদ্ধাপরায়ণ। অথচ, বর্তমান সমাজে যাদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, অধিকাংশই সাত্ত্বিক আহার করেন না, অধিকন্তু পূজামণ্ডপে প্রবেশের আগে না হয় পরে চা, পান, সিগারেট এসবের অন্তত কোনো একটির পূজা করে নেন। আর শাস্ত্রজ্ঞানের কথা কী বলব! অনেকে সঠিকভাবে মন্ত্রই উচ্চারণ করতে পারেন না। এখন তোমার কাছে প্রশ্ন, যথার্থ গুণযুক্ত না হলে, কেবল তোতা পাখির মতো মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারলেই কি কেউ পূজা করার অধিকারী হন? অথবা তাদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করেই বা কী লাভ? তাদের আহ্বানে কি পূজ্যদেব আবির্ভূত হন, নাকি সন্তুষ্ট হন? আমরা কোনো ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যথিত করতে চাই না, শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও যারা পৌরহিত্য করছেন, তারা যেন দয়া করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন হন এবং যারা পুরোহিত নির্বাচন করছেন, তারাও যেন যোগ্য ব্যক্তিকেই পূজাকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম না নিয়েও (এমনকি শূদ্রকুলেও) যদি কেউ ঐ গুণগুলো অর্জন করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ বলে বিদিত হবেন এবং তিনিই পূজা ও অন্যান্য বৈদিক সংস্কার কার্য সম্পাদনের অধিকারী।

❋ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর সারকথা

শাক্ত ও বৈষ্ণব– এদুটো সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে বিদ্যমান। বৈষ্ণবগণের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যেখানে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনাকেই সর্বোচ্চ ও সকলের কর্তব্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আবার, শাক্তদের সবচেয়ে আদরণীয় গ্রন্থ হলো শ্রীশ্রীচণ্ডী, যেখানে শক্তি বা প্রকৃতিকে সবকিছুর মূল বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। চণ্ডী অনুসারে, শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ; আর ভগবদ্গীতা অনুসারে, শক্তিমান পরমেশ্বরই সবকিছুর কারণ। এখন প্রশ্ন হলো দুটোই কি ঠিক? যদি একটি ভুল হয়, তবে সঠিক কোনটি? নাকি একটি আপেক্ষিক সত্য, অন্যটি পরম সত্য? কেউ কেউ বলে থাকেন, যেহেতু শক্তি-শক্তিমান অভিন্ন, অতএব, উভয়ই এক। কিন্তু না, এক হলেও তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে– একটি হলো শক্তি, অপরটি শক্তিমান; শক্তি হলো বস্তুর গুণ, শক্তিমান বস্তু। তাপশক্তি দ্বারা আগুন দগ্ধ করে, আলোকশক্তি দ্বারা সূর্য কিরণ বা আলোক প্রদান করে, চৌম্বকশক্তি দ্বারা চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। একইভাবে, নিজশক্তি

দ্বারা ভগবানই অসুরদের বধ করেন, মায়াশক্তি দ্বারা ভগবানই জীবকে মায়াগ্রস্ত করেন, আবার, চিচ্ছক্তি দ্বারা ভগবানই মায়ামুক্ত করেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি দ্বারা ভগবানই কার্য করেন। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, মূল কর্তা হলো শক্তিমান। কেউ বলতে পারেন যে, যদি শক্তি ক্রিয়া না করে, তবে শক্তিমান কিছুই করতে পারবে না; অতএব, শক্তিই মূল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শক্তির স্বতন্ত্রতা নেই, পক্ষান্তরে শক্তিমান সর্বদাই স্বতন্ত্র, স্বাধীন। তাই তাঁকে বলা হয় 'স্বরাট পুরুষ' এবং পরমব্রহ্মের সমস্ত শক্তি সর্বদাই তাঁর অধীন। সুতরাং, শক্তিমানের ইচ্ছা ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্রভাবে কোনোকিছু করার সামর্থ্য নেই, ঠিক যেমন, পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সূর্য উদিত না হলে, সেখানে সূর্যের আলোক শক্তি ক্রিয়া করতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, যদি কেউ বলেন, তাপশক্তিই বস্তুকে দগ্ধ করে, চৌম্বকশক্তিই লোহাকে আকর্ষণ করে– একথাও মিথ্যা নয়। একইভাবে, শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ– একথাও মিথ্যা নয়, শক্তি দ্বারাই ভগবান কার্য করেন। তাই, তা আপেক্ষিক সত্য; কেননা এই সত্য শক্তিমানের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বেদে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তারপর তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে, তাঁরই দৃষ্টিপাতের ফলে জড়াপ্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়ে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গা সম্পর্কে ব্রহ্মসংহিতায় (৫.৪৪) ব্রহ্মা বলেছেন–

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

সুতরাং, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর সিদ্ধান্তের মূলে কোনো বিরোধ নেই; কেননা শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তেরই অনুগমন করে, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তই পরম সত্য– ***সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।*** *এখানে* ***সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য*** এবং ***মাম্ একম্*** শব্দগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানই প্রধান শরণ্য। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণভক্তগণের শক্তির প্রতি শরণাগতি চরমে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতি

শরণাগতির লক্ষ্যে, যেহেতু শক্তির কৃপাতেই শক্তিমানকে লাভ করা যায়। চণ্ডীতে কিন্তু বলা হয়নি যে, কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করে একমাত্র দেবী দুর্গার শরণাগত হও। বরং চণ্ডীর সর্বশেষ সিদ্ধান্তস্বরূপ দুর্গাই সমাধি বৈশ্যকে বলেন যে, ভবিষ্যতে তার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে– ***জ্ঞানং ভবিষ্যতি (চণ্ডী ১৩.২৫);*** শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাই সেই ব্রহ্মজ্ঞান, যেখানে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড ৬৩ অধ্যায়) দেখা যায় যে, সমাধি বৈশ্যর প্রার্থনায় দেবীদুর্গা দেবতাদের সুদুর্লভ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন–

সর্বসারঞ্চ যজ্জ্ঞানং সুরষীণাং সুদুর্লভম্।
তদগৃহ্যতাং মহাভাগ গচ্ছ বৎস হরেঃ পদম্॥
স্মরনং বন্দনং ধ্যানমর্চনং গুণকীর্তনম্।
শ্রবণং ভাবনং সেবা সর্বং কৃষ্ণে নিবেদন্ ॥৬৩.১৮-১৯॥

দেবী সমাধি বৈশ্যকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার, কৃষ্ণমন্ত্র জপ করার নির্দেশ দেন– *কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং গৃহাণ কৃষ্ণদাস্যম্।* (ইতোপূর্বে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)

তবে কি শক্তিপূজা করা উচিত নয়? নাকি শক্তিমানকে বাদ দিয়ে কেবল শক্তিরই উপাসনা করা উচিত?

যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন এবং সেই সাথে শক্তি শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব সুতরাং শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ। আবার, যেহেতু শক্তিরও কারণ শক্তিমান, তাই শক্তিমানই পরমারাধ্য, তবে তা শক্তিকে বাদ দিয়ে নয়। তাই বৈষ্ণবগণ সমস্ত শক্তির মূল আদ্যাশক্তি শ্রীমতি রাধারাণীসহ সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন।

✵ বহুদেবতার পূজা করেও আমরা একেশ্বরবাদী

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়– *একমেব অদ্বিতীয়ম্*। সেই এক পরমেশ্বর ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণু আদি সমস্ত অবতারগণ তাঁরই স্বাংশ প্রকাশ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

"পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতার হচ্ছেন ভগবানের অংশ বা কলা (অংশের অংশ) অবতার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের (অসুরদের) অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।"

শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার ৫ম অধ্যায় (১৪/২)-এ পরমেশ্বরকে 'এক ও অদ্বিতীয়স্বরূপ' বলা হয়েছে এবং খানিক পরেই অর্থাৎ শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার ৫ম অধ্যায় (২০/২)-এ বলা হয়েছে–

প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো নভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধি ক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥

"যাঁর ত্রিবিক্রমে সমস্ত প্রাণী বাস করে, সিংহের ন্যায় যিনি ভয়ংকর, মৎস্যাদি বিভিন্ন রূপে যিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা, বেদবাণীতে অথবা জীবদেহে অন্তর্যামীরূপে যিনি বিরাজমান, সে বিষ্ণু স্বমহিমায় সকলের দ্বারা স্তুত হন।"

অভিনয় জগতে একই ব্যক্তি বিভিন্ন রূপে নিজেকে উপস্থাপন করে, তেমনি, ***রামাদি মূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠান (ব্রহ্মসংহিতা-৫/৩৯)***– পরমেশ্বর যদিও এক, তথাপি লীলা বিস্তারের জন্য তিনি রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, বরাহ ইত্যাদি বহু রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন (*একো অহং বহুস্যাম*)। বেদের বহু স্থানে এই তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে (৫.১৩) বলা হয়েছে– ***বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্... একম্ ॥*** অর্থাৎ, "এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টাই অনেক রূপে প্রকাশিত হন।" কিন্তু নির্বোধেরা এসমস্ত রূপকে এক ভগবান থেকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে কঠোপনিষদে (২.১.১০) বলা হয়েছে–

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, সর্বরূপ, সমস্তকিছুর একমাত্র কারণ পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তম– যিনি এখানে, এই পৃথিবীতে রয়েছেন, তিনিই পরলোকে তথা অন্যান্য বিভিন্নলোকেও রয়েছেন। একই পরমাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এই

অদ্বয় ব্রহ্মকে লীলাবসে নানা নামে এবং নানা রূপে প্রকাশিত দেখে মোহবশে তাতে নানা ভাগে বিভক্ত বলে মনে করে, তাকে বারবার মৃত্যুর অধীন হতে হয়, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। অতএব, দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, সেই একই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা প্রকাশমান, আর এই সমগ্র জগৎ অন্তর-বাহিরে সেই একই পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় বাস্তবে তাঁরই স্বরূপ।

"পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়" (*একমেবাদ্বিতীয়ম্– ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬.২.১-২*)– একথা স্বীকার করে; কিন্তু একই গ্রন্থের পরবর্তী মন্ত্রে উল্লেখিত (***তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি– ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬.২.৩; তৈত্তিরেয় শ্রুতি, ব্রহ্মানন্দবল্লী ৬.১***) "তিনি এক হয়েও বহু হতে পারেন"– এই বাক্যকে তারা স্বীকার করতে চায় না– যদিও তাদের স্বীকার বা অস্বীকারে পরমেশ্বরের কিছু যায় আসে না। তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, এক পরমেশ্বর কখনোই বহু হতে পারে না। যখন বলা হয় 'ভগবানের অংশ অবতার', তারা মনে করে ভগবান বুঝি ভাগ হয়ে তার অংশ কমে গেল। এভাবে মূর্খতাবশত কেউ কেউ একেশ্বরকে যথার্থ জানতে না পেরে তাঁর অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করে।

একই ব্যক্তি যদি অনেক প্রকার আয়নার সামনে দাঁড়ান, তবে তিনি নিজেকে বহু রূপে দেখবেন– কোনোটিতে খাটো, কোনোটিতে লম্বা, কোনোটিতে ছোট, আবার কোনোটিতে বড় ইত্যাদি। তবু তারা অভিন্ন বা একই ব্যক্তি। আবার, সূর্য অসংখ্য জলাশয়ে পৃথকভাবে অসংখ্যরূপে প্রতিবিম্বিত হলেও এক। তবে, প্রতিবিম্বিত বস্তুর কার্যাবলি একই রকম হয়, কিন্তু সর্বশক্তিমত্তাহেতু পরমেশ্বর এক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য করতে সমর্থ। সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, "না, তিনি কখনো বহু রূপ ধারণ করতে পারেন না" তবে তাঁকে সীমিত ও অপমান করা হয় এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা হয়। তাই তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও আমরা একেশ্বরবাদী; আর দেবদেবীরা হচ্ছেন এক পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। ঋগ্বেদ-সংহিতায় (৭.৪০.৫) বলা হয়েছে–

অস্য দেবস্য মীড়হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভি।

"অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্য দ্বারা প্রাপনীয় অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ।"

তাঁরা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সৃষ্ট এ জড়প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেন। যেমন, ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করেন, ইন্দ্র বৃষ্টি, বরুণ জল, অগ্নিদেব অগ্নি, পবনদেব বায়ু, সূর্যদেব সূর্যকে পরিচালনা করেন এবং তা দেশের সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের ন্যায়। ভগবানও প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোকে দেবদেবীদের দ্বারা পরিচালনা করেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ (কঠোপনিষদ্ ২.৩.৩)।

"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা এই পরমেশ্বরের ভয়ে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু এবং যম আদি সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ কাজ অতি সাবধানতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরই ভয়ে অগ্নি, সূর্য তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হয়, ইন্দ্র বারিপাত করেন এবং পঞ্চম মৃত্যুদেব প্রাণীর জীবনাবসান করেন।"

দেবদেবীরা আমাদের পূজনীয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কেবল আমাদেরই নয়, এমনকি দেবদেবীগণেরও পরম আরাধ্য। যেমন, সাধারণ জনগণ যেরূপ প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান করেন, অন্যান্য মন্ত্রীগণও তদ্রূপ তাঁকে সম্মান করেন। অর্থাৎ, প্রধান মন্ত্রী সকলেরই সম্মানীয়। মন্ত্রিগণের ন্যায় দেবদেবীগণ ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ হিসেবে জগৎ পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন। সুতরাং, দেবদেবীগণ ভগবানের সমকক্ষ নন, তবু তারা সম্মানীয়।

যেমন, প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধান। তিনি সকল জনগণের সম্মানীয় বা পূজনীয়। তাই বলে অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্মান করা যাবে না, তা রাষ্ট্রের কোনো আইনে নেই। বরং, কেউ যদি কেবল প্রধান মন্ত্রীকে সম্মান করে, আর তাঁর অনুগত অন্যান্য মন্ত্রীদের অসম্মান করে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। তেমনি, দেবতাদের যদি কেউ অসম্মান বা অবজ্ঞা করে, তবে ভগবান নিশ্চয়ই তার প্রতি অপ্রসন্ন হবেন। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, দেবদেবীগণ আমাদের পূজনীয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই পরম আরাধ্য– ***আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনয় তদ্ধাম বৃন্দাবন॥*** ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর ভগবান।

দেবদেবীদের অস্তিত্বের প্রামাণিকতা

কেউ কেউ মনে করেন যে, "দেবতা বলতে কিছু নেই, তা কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি। আর দেবতাদের রূপ মনুষ্য কল্পিত।" এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বৈদিকশাস্ত্রে দেবতাদের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, আর বৈদিকশাস্ত্র অভ্রান্ত। নাস্তিকেরা মনে করে, ধার্মিকেরা বোধ হয় মূর্খতাবশত চন্দ্র, সূর্য, জল, আগুন ইত্যাদি প্রকৃতির জড় উপাদানগুলোকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে। বাস্তবিকই তাদের মূর্খ বলা যায়, যারা এগুলোকে দেবতা মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো দেবতা নয়। দেবতা বলতে বোঝায় যাঁর মধ্যে দিব্য গুণ বিদ্যমান। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে স্বল্পমাত্রায় দৈবীগুণ দেখা যায়, যার ফলে মানুষও কখনো কখনো আশ্চর্যজনক কিছু করতে পারে।

তেমনি দেবতাদের মধ্যে অসাধারণ কিছু করার মতো দিব্যগুণ বা দৈবীশক্তি রয়েছে বলে তাদের দেবতা বলা হয়। যেমন, চন্দ্রের কিরণেই শস্য পরিপুষ্ট হয়, যা খেয়ে প্রাণীগণ জীবনধারণ করে, সূর্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, তার তাপ ও আলোকশক্তি ব্যতীত জগৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তো, এভাবে বাতাস, জল, আগুন ইত্যাদি প্রকৃতির উপাদানগুলো অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, **জড়পদার্থ কখনো স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না; ঠিক যেমন, চালক ব্যতীত গাড়ি চলতে পারে না। সূর্য একটি জড়পদার্থ। কিন্তু আমরা জানি জড়বস্তু হওয়া সত্ত্বেও সূর্য তার কক্ষপথে গতিশীল। শুধু সূর্যই নয়, প্রতিটি গ্রহই গতিশীল। জড়বস্তু যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না, সুতরাং নিশ্চয় কোনো চেতন সত্তা এগুলোকে গতিশীল বা ক্রিয়াশীল করছে। বৈদিকশাস্ত্র অনুসারে, দেবতাগণই হলেন সেই চেতনসত্তা। দেবতাগণ হলেন প্রকৃতির সমস্ত উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী, যাঁরা পরম চেতনসত্তা পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় সেসব নিয়ন্ত্রণ করছেন–*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ। ভ.গী ৯.১০*।** যেমন, সূর্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হলেন বিবস্বান, যাঁকে সূর্যদেব বলা হয়; চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হলেন সোম, যাঁকে চন্দ্রদেব বলা হয়, জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতি। এভাবে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে বহু দেবদেবী রয়েছেন। কঠোপনিষদে (২.৩.৩) বলা হয়েছে–

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা এই পরমেশ্বরের ভয়ে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু এবং যম আদি সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ কাজ অতি সাবধানতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে থাকেন। অর্থাৎ, তাঁরই ভয়ে অগ্নি, সূর্য তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হয়, ইন্দ্র বারিপাত করেন এবং পঞ্চম মৃত্যুদেব প্রাণীর জীবনাবসান করেন।" তাই ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ দেবতাগণ যেহেতু আমাদের প্রকৃতির উপাদানগুলো সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ করছেন; তাই তাঁরা অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু আমাদের, এমনকি দেবতাগণেরও আরাধ্য কেবল পরমেশ্বর ভগবান।

❋ দেবদেবীদের রূপ কি কাল্পনিক?

বৈদিকশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন মহর্ষি ব্যাসদেব, যিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েই তিনি বৈদিক জ্ঞান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান ও দেবদেবীগণ যে শুধুই শক্তি নন, সেই সাথে অবয়ববিশিষ্ট, তা বেদে উল্লেখ আছে। যেমন– শিব প্রসঙ্গে অথর্ববেদ সংহিতা,

একাদশ কাণ্ড, প্রথম অনুবাক, ৫ম সূক্তে বর্ণিত হয়েছে–"হে ভব, তোমার যে বিমোহক তনু আছে, জগতের সাক্ষী, অমরণধর্ম তোমাকে নমস্কার। হে পশুপতি, তোমার মুখের উদ্দেশ্যে নমস্কার। সেরূপ তোমার শরীরের চর্ম, নীলপীতাদি বর্ণ, সম্যকদর্শন ও প্রত্যগাত্মরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার হস্তপদাদি অঙ্গের উদ্দেশ্যে নমস্কার। লীলাবিগ্রহধারী তোমার উদর, জিহ্বা, মুখ, দন্ত ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার।"

বরুণদেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সংহিতায় (১/২৫/১৬, ১৮) বলা হয়েছে–"বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট। সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দেখেছি, ভূমিতে তাঁর রথ বিশেষ করে দেখেছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন।"

দেবীদুর্গার রূপ বর্ণনা করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

ওঁ জটাজুপসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং ॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥
মৃণালায়ত্ সংস্পর্শ দশবাহু-সমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণংতথা শক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাডঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরচ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং ॥
রক্তারক্তিকৃতাঙ্গং চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি-ভীষণাননং ॥
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণাং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
প্রসন্নাবদনাংদেবীং সর্বকর্মফলপ্রদাং।

স্তয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।

চণ্ডাচণ্ডতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা ॥

অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভি সততং পরিবেষ্টিতাং।

চিন্তায়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম কামার্থমোক্ষদাম্ ॥

দেবী দুর্গার কেশরাজি জটাজুট সমাযুক্তা, অর্ধচন্দ্র শোভিত শেখরা এবং ত্রিনয়নী। তাঁর বদন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, বর্ণ অতসী ফুলের মতো হরিদ্রাভ। তিনি ত্রিলোকে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নবযৌবন সম্পন্না, সর্বাভরণ-ভূষিতা, সূচারু-দশনা, পীনোন্নত পয়োধরা। তাঁর দক্ষিণ পঞ্চকরে উর্ধ্ব- অধঃক্রমে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করে ঐরূপক্রমে খেটক, ধেনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু শোভিত। দেবীর পদতলে ছিন্নস্কন্ধ মহিষ। উক্ত মহিষ থেকে উদ্ভূত এক খড়গপাণি দানব। দেবীর নিক্ষিপ্ত শূল ঐ দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করছে। তাতে দৈত্যের দেহ রুধিরাক্ত, চক্ষু রোষ কষায়িত। দেবী নাগপাশযুক্ত, তাতে দৈত্যের কেশ আকর্ষণ করে আছেন। তাতে দৈত্যের রুধির বমন ও ভ্রুকুটিতে ভীষণ দর্শন হয়েছে। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহোপরি এবং বামপদ দৈত্যের কাঁধে অবস্থিত। দেবীর অষ্টশক্তি যথা- উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড নায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা পরিবেষ্টিতা। দেবী ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- চতুর্বর্গ ফলদাত্রী এবং জগদ্ধাত্রী। ব্রহ্মাদি সকলের দ্বারা পূজিত।

ধরুন একজন অদেখা, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আজ আপনার সাক্ষাৎ করতে হবে। তার সম্বন্ধে জানে এমন আরেকজন যদি আপনাকে বলে দেন যে, সেই ব্যক্তির নাম অমুক, দেখতে খুব লম্বা, গায়ের রং কুচকুচে কলো, মাথায় কোকড়া চুল, উন্নত নাসিকা, দাঁতগুলো খুব সুন্দর ধবধবে সাদা, পরনে নীল শার্ট, কালো প্যান্ট, মাথায় ক্যাপ, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা এবং তিনি অমুক জায়গায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে আপনি কি তাকে চিনতে পারবেন না?

নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। শুধু আপনিই নন, এমন বর্ণনা থাকলে সকলেই চিনতে পারবে। চিত্রশিল্পীকে যদি কোনো বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়, তাহলে তিনি বর্ণনা অনুযায়ী সেই বিষয়কে তার চিত্রে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন কি না? নিশ্চয়ই পারবেন।

ইতিহাসে আলেকজেন্ডারের বর্ণনা রয়েছে। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধ করতেন। মাথায় বাঘের মুখখচিত মুকুট ধারণ করতেন। তার মুকুটে ঝুটি ছিল। তার চোখ বিশেষ বর্ণের ছিল। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। তা দেখে

পৃথিবীতে বিভিন্ন চিত্রশিল্পী আলেকজেন্ডারের ছবি এঁকেছে। যে ভঙ্গিমায়ই থাকুক না কেন, আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ছবিতে দেখলে বুঝতে পারি এটা আলেকজেন্ডারের ছবি। যদিও বর্তমান সমাজে কেউ আলেকজেন্ডারকে দেখেনি। সুতরাং, একটি শিশুকে যদি শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন ভঙ্গিতে আঁকা দেবীদুর্গার অনেকগুলো ছবি দেখিয়ে বলা হয় যে, ইনি কে? তবে হাতে ত্রিশুল, ত্রিনয়ন, দশভূজা, সিংহবাহিনী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখে শিশুটি বুঝতে পারবে যে এটা দেবী দুর্গাই। কারণ, যে ভঙ্গিতেই থাক না কেন, প্রতিটি ছবিতেই একই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে। এভাবে শিব, ব্রহ্মা আদি অন্যান্য দেবদেবীদেরও রূপের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। সেই বর্ণনানুসারে তাঁদের বিগ্রহ তৈরি করে সেবা-পূজা করা হয়। তাই শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে যখন ভগবান বা দেবদেবীগণের চিত্র আঁকা হয় বা প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়, তখন অবশ্যই সে রূপ কাল্পনিক নয়।

✵ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করলে দেবদেবীগণ আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ঋগ্বেদ-সংহিতা(১.২২.২০)। এই ঋকমন্ত্র অনুসারে, পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, যিনি সুরগণের তথা দেবতাগণেরও আরাধ্য। সুতরাং, মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীর যে তিনিই আরাধ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী ঋকমন্ত্রে (১.২২.২১) বলা হয়েছে যে, ***তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥২১॥*** "স্তুতিবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা সে বিষ্ণুর পরমপদই প্রদীপ্ত করেন।" এর কারণস্বরূপ অপর এক শ্রুতিমন্ত্রে *(ঈশোপনিষদ, মন্ত্র ১২)* বলা হয়েছে–

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥

অর্থাৎ, "দেবতাদের উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু পরমতত্ত্বের সাকারত্বকে অস্বীকার করে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ ও নাস্তিকেরা আরো অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।"

তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন–

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম্ প্রপদ্যতে।

বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

অর্থাৎ, "বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" আর এ

একই কথা মহাভারতেও (অশ্বমেধিকপর্ব, ১১৭.৩৩) বলা হয়েছে–

জন্মজন্মান্তরসহস্রেষু তপসা ভাবিতাত্মনাম্।

ভক্তিরুৎপদ্যতে তত মনুষ্যাণাং ন সংশয়ঃ ॥

ভগবদ্গীতার পরবর্তী শ্লোকে (৭.২০) বলা হয়েছে–

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"জড় কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।"

লক্ষ্য করুন, ১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে– *জ্ঞানবান মাম্ প্রপদ্যতে। আর, ২০নং শ্লোকে বলা হয়েছে– হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ।* সুতরাং, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে, জ্ঞানবান ব্যক্তি কেবল ভগবানেরই আরাধনা করবেন। আবার, ৭/২৩ শ্লোকে বলা হয়েছে–

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

"অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ সেই ফল সীমিত ও অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন।" এখানেও স্পষ্ট যে, দেবোপাসনা ও ভগবদুপাসনার ফল ভিন্ন। সুতরাং, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চান, তবে তার দেবপূজার আবশ্যকতা নেই। *কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। (ভ.গী. ৪১২)– "এজগতে যারা সকামকর্মের সিদ্ধি কামনা করে, তারা দেবতাদের উপাসনা করে।"* তাছাড়া, শাস্ত্রে দেবপূজাকে অবৈধ বলা হয়েছে।

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ (ভ.গী. ৯.২৩)

"হে কৌন্তেয়, যারা অন্য দেবতার ভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে তাদের পূজা করে, পরোক্ষভাবে তারা আমারই পূজা করলেও তা অবিধিপূর্বক।"

গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে যদি কেউ শাখা-প্রশাখায় জল দেয়, তবে পরোক্ষভাবে গাছে জল দেওয়া হলেও তা সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অথবা সাধারণ নিয়মনীতি পালন না করার ফলে হয়। আবার, দেবতারা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর ভগবানের সার্বভৌম প্রশাসনের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শাসক ও সঞ্চালক। শাসক ও সঞ্চালকেরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত থাকেন এবং তাদের উৎকোচ (ঘুষ) দেয়া অবৈধ। তাই দেবপূজাকে এখানে অবিধিপূর্বকম্ বলা হয়েছে। সারকথা হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান অনাবশ্যক দেবোপাসনা কখনোই অনুমোদন করেন

না। পক্ষান্তরে ভগবান বলেছেন–

মদ্ভক্ত্যা ন বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা বীতকল্মষাঃ।

মদ্ভক্তানান্তু মানুষ্যে সফলং জন্ম পাণ্ডবঃ ॥

মহাভারত, অশ্বমেধিকপর্ব, ১৭.৩১

"আমার ভক্তেরা বিনষ্ট হয় না। আমার ভক্তেরা পাপহীন হয়ে থাকে এবং আমার ভক্তগণেরই মনুষ্যলোকে জন্ম সফল হয়।"

পূজিতে তু জগন্নাথে সর্বে দেবাশ্চ পূজিতাঃ।

অতো যেন প্রকারেণ পূজনীয়ো মহাপ্রভুঃ ॥

অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৮২.২৬)

"জগন্নাথকে অর্চনা বা পূজা করলে সকল দেবতাই পূজিত হন। অতএব, যেকোনোরূপে অনাদিনিধন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সেই মহাপ্রভুরই পূজা করতে হয়।"

পদ্মপুরাণে নারদ মুনির প্রতি মহাদেবের উক্তি–

বিষ্ণোঃ পূজা কৃতা তেন সর্বেষাং পূজনং কৃতম্।

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৮.১৫)

অর্থাৎ, "যিনি বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁর দ্বারা সকলেরই পূজা করা হয়।"

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ (ভাগবত ১/২/২৬)

"যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি (অতএব, দেবতাদের প্রতিও) শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।"

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভা. ৪/৩১/১৪)

অর্থাৎ, "বৃক্ষমূলে জলসেচন করলে যেমন সেই গাছের কাণ্ড, ডাল, উপখাশা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তিলাভ করে এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সমস্ত দেবতার পূজা হয়ে যায়। তখন ভগবানের বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন। তাই কখনো দেবদেবী-পূজাকে ভগবদ্ভক্তির সমকক্ষ মনে করা উচিত নয়।"

ঋগবেদ সংহিতায় (১০.১২১.২) বলা হয়েছে–

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

"যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃত-স্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাপন্ন– তিনি (সেই পরমেশ্বর ভগবান) ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে পূজা করব?" তাই অপর এক শ্রুতিমন্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪.১৩*) বলা হয়েছে–

যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥

অর্থাৎ, "যে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর সমস্ত দেবতাদের অধিপতি, যাঁর মধ্যে নিখিল বিশ্ব আশ্রিত, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত অবস্থায় যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ তথা সকল প্রাণীর প্রশাসক, সেই আনন্দস্বরূপ পরমদেব সর্বাধার সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক যেন পুজা করি। অর্থাৎ সর্বস্ব তাঁকে সমর্পণ করে যেন আমরা তাঁর চিন্তায় নিমগ্ন থাকি। এই হলো তাঁকে পাওয়ার সহজ উপায়।"

মূলকথা, ভগবানের বিবিধ শক্তির প্রকাশ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকরূপে দেবতাগণ অবশ্যই আমাদের সম্মানীয়। কিন্তু সকলের, এমনকি দেবতাদেরও আরাধ্য হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে আরাধনা ও পূজা করা হলে সকলেই সন্তুষ্ট।

✵ বৈষ্ণবগণ কীভাবে দুর্গা ও অন্যান্য দেবদেবীগণকে সন্তুষ্ট করেন?

বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে আমরা দেখলাম যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করলে, সমস্ত দেবদেবী আপনাথেকেই সন্তুষ্ট হন। এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকেও সন্তুষ্ট করা যায়। তাই, ভগবদ্ভক্তগণ দেবতাদের যথাযোগ্য সম্মান রেখে শ্রদ্ধাসহকারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। **ভগবানের আজ্ঞাবহ দেবতাগণ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং শক্তি ইত্যাদি যখন কেউ নিজের ইন্দ্রিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে, তখন দেবপূজা করলেও দেবতাগণ প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টই হন। পক্ষান্তরে, যখন কেউ সবকিছু জগৎকল্যাণে তথা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে, তখনই এসবের যথার্থ উপযোগ হয় এবং তখন ধনদাত্রী লক্ষ্মী, জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী, শক্তিস্বরূপা দুর্গা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রমুখ সমস্ত দেবদেবী তার প্রতি প্রসন্ন হন।** তাছাড়া, বৈষ্ণবগণ প্রতিবার ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতি ও ভোগাদি নিবেদনের পর

সেসকল দ্রব্য সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন, যার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই সকল দেবদেবীর পূজা সম্পাদিত হয়।

তাছাড়া, ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে সুভদ্রা হলেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎশক্তি, যিনি যোগমায়ারূপে ক্রিয়া করেন এবং ভগবানের আজ্ঞানুসারে সেই একই শক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হিসেবে দুর্গারূপে জড়জগৎ পরিচালনা করেন। সুভদ্রারূপে তিনি বিশেষত ভক্তিস্বরূপা, কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। তাই বৈষ্ণবগণের নিকট জগন্নাথ (কৃষ্ণ) এবং বলদেব (বলরাম)-এর সঙ্গে সুভদ্রারূপেই যোগমায়া নিত্য পূজিত হন। তদুপরি, শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে–

তস্যাদ্যো প্রকৃতি রাধিকা নিত্য নির্গুণা।
যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ, "লক্ষ্মী, দুর্গাদি সমস্ত ভগবৎ-শক্তিবর্গ যাঁর অংশ, সেই নিত্যনির্গুণা আদিশক্তি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি।" শ্রীপদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে শ্রীশিবজি নারদকে বললেন–

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মী-স্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী ॥
তৎ সো প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ ।
তৎকলাকোটিকোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রীগুণাত্মিকাঃ॥

অর্থাৎ, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ, দেবাদিদেব এবং শ্রীমতি রাধিকা হচ্ছেন তাঁর নিত্য হ্লাদিনীশক্তি। রাধিকা সর্বলক্ষ্মী তাঁর অংশস্বরূপা। হে নারদ, দুর্গাদি দেবীগণ শ্রীমতিরাধিকার কোটি কোটি অংশের এক কলা।"

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতি রাধারাণী হলেন দুর্গা আদি সমস্ত শক্তির মূল, যাঁর পূজা করা হলে সমস্ত শক্তিরই পূজা হয়ে যায়। আর বৈষ্ণবগণ নিত্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করে থাকেন, যাঁরা কেবল দেবী দুর্গারই নন, সমস্ত দেবতা এমনকি দেবাদিদেব মহাদেবেরও আরাধ্য।

✵ দুর্গাদেবীর কাছে কী প্রার্থনা করা উচিত?

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধারণত মানুষ জড়জাগতিক লাভের আশায় দেবদেবীর কাছে ধন, জন, যশ, রূপ ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী বিষয় প্রার্থনা করে। কিন্তু সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি বা বৈষ্ণবগণ কোনো জাগতিক লাভালাভের জন্য মায়ের আরাধনা করেন না; তাঁরা কেবল তাঁর সন্তুষ্টিবিধানই কামনা করে তাঁর কাছে ভগবদ্ভক্তিই প্রার্থনা করেন। ভগবানের কাছে কী প্রার্থনা করা উচিত তা আমাদের শেখাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে বলেছেন–

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ী ॥

"হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি, যেন জন্মে জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।"

ব্রজবালিকারা দেবীদুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন *(শ্রীমদ্ভাগবত–১০.২২.৪)* –

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥

"হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তিধারিণী এবং শক্তিশালিনী নিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন।" অর্থাৎ, ব্রজগোপিকাগণ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই দুর্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন।

শাস্ত্রানুসারে, দেবীদুর্গা *কৃষ্ণভক্তিপ্রদা* (ব্র.বৈ.পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৯.৫১)। তাই ভগবদ্ভক্তগণ দুর্গাদেবীর কাছে ধন, জন, যশ ও রূপের প্রার্থনা করলেও তা বিষয়কামীর মতো জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য নয়। তাঁরা প্রার্থনা করেন– "হে জগজ্জননী দুর্গে, আমায় কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করো, আমায় কৃষ্ণভক্তজনের সঙ্গ প্রদান করো, আমায় কৃষ্ণভক্তির যশ প্রদান করো এবং চিন্ময় জগতে কৃষ্ণদাসত্বরূপ নিত্যস্বরূপ প্রদান করো।"

সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যেন আমাদের আসক্তি ও ভক্তি লাভ হয়, দুর্গাদেবীর কাছে সেই প্রার্থনাই সকলের করা উচিত।

– হরেকৃষ্ণ –

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অনূদিত ও ভাষ্যকৃত
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

২. মহাভারত – হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত
বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ

৩. শ্রীশ্রী চণ্ডী
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত

৪. মার্কণ্ডেয় পুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৫. স্কন্দপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৬. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৭. পদ্মপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৮. শিবপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৯. ঋগ্বেদ সংহিতা
রমেশ চন্দ্র দত্ত অনূদিত, হরফ প্রকাশনী

১০. অথর্ববেদ সংহিতা
দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় লাইব্রেরি

১১. যজুর্বেদ সংহিতা

১২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

১৩. বিষ্ণুপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশাস

১৪. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

১৫. শ্রীচৈতন্য ভাগবত
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদকৃত ভাষ্য

১৬. মনুসংহিতা
১৭. জগজ্জননী দেবী দুর্গা
১৮. হরিবংশ
১৯. শ্রীগর্গ-সংহিতা
২০. শ্রীব্রহ্মসংহিতা
২১. শ্রীঈশোপনিষদ
২২. শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
২৩. শ্রীকঠোপনিষদ
২৪. শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ
২৫. বেদান্তসূত্র
২৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ
২৭. তৈত্তিরীয় আরণ্যক
২৮. মূর্তিপূজার রহস্য

গ্রন্থটি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য বা পরামর্শ থাকলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হলো– **arsandhane@gmail.com**
(আপনার মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে)